(সা) হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেন, 'যে বক্তি কোন অমুসলিম নাগরিকের উপর জুলুম চালাবে রোজ হাশরে আমি জালিমের বিরুদ্ধে ঐ অমুসলিমের পক্ষ অবলম্বন করব।"—(মাযহারী)

উপরোক্ত রিওয়ায়েতসমূহের প্রেক্ষিতে কতিপয় ইমাম এ মত পোষণ করেন যে, শরীয়ত জিযিয়ার বিশেষ কোন হার নির্দিষ্ট করে দেয়নি, বরং তা ইসলামী শাসকের সুবিবেচনার উপর নির্ভরশীল। তিনি অমুসলিমদের অবস্থা পর্যালোচনা করে যা সঙ্গত মনে হয়, ধার্য করবেন।

আমাদের এ পর্যন্ত আলোচনা থেকে একটি বিষয় পরিষ্কার হল যে, জিযিয়া প্রথা ইসলামের বিনিময় নয়' বরং তা আদায় করা হয় কাফিরদের মৃত্যুদণ্ড মওকুফের বিনিময়ে। সুতরাং এ সন্দেহ যেন না হয় যে, অল্প মূল্যের বিনিময়ে ওদের কুফরী অবস্থায় বহাল থাকার অনুমতি কেমন করে দেয়া হল? কারণ এমন অনেক লোক আছে, যাদের স্বধর্মে অবিচল থেকে বিনা জিযিয়ায় ইসলামী রাষ্ট্রের বসবাসের অনুমতি দেয়া হয়। যেমন মহিলা, শিশু, বৃদ্ধ, বিকলাঙ্গ এবং যাজক সম্প্রদায়।

আলোচ্য আয়াতে عَنْ يَّدٍ শব্দ দু'টি ব্যবহৃত হয়েছে। عَنْ অর্থ এখানে কারণ, يَد অর্থ শক্তি ও বিজয়। তাই জিযিয়া যেন খয়রাতি চাদা প্রদানের মত না হয় বরং তা হবে ইসলামের বিজয়কে মেনে নিয়ে একান্ত অনুগত নাগরিক হিসেবে।—রূহুল-মা'আনী)। এর পরের বাক্য হল—وَهُمْ صَاغِرُوْنَ ইমাম শাফেয়ী (র)-র তফসীর অনুযায়ী এর অর্থ হল—তারা যেন ইসলামের সাধারণ আইন-কানুনের আনুগত্যকে নিজেদের কর্তব্য রূপে গ্রহণ করে নেয়—(রূহুল-মা'আনী তফসীরে-মাযহারী)।

জিযিয়া প্রদানে স্বীকৃত হলে ওদের সাথে যুদ্ধ বন্ধ করার যে আদেশ আয়াতে হয়েছে তা অধিকাংশ ইমামের মতে সকল অমুসলিমের বেলায়ই প্রযোজ্য। তারা আহ্‌লে-কিতাব হোক বা অন্য কেউ। তবে আরবের মুশরিকরা এ আদেশের অন্তর্ভুক্ত নয়, তাদের থেকে জিযিয়া গৃহীত হয়নি।

দ্বিতীয় আয়াত হল প্রথম আয়াতের ব্যাখ্যা। প্রথম আয়াতে মোটামুটিভাবে বলা হয় যে, আহ্‌লে-কিতাবগণ আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান রাখে না। দ্বিতীয় আয়াতে তারা ব্যাখ্যা দিয়ে বলা হয় যে, ইহুদীরা হযরত ওযাইর (আ) ও খৃস্টানরা হযরত ঈসা (আ)-কে আল্লাহ্‌র পুত্র সাব্যস্ত করে। তাই তাদের ঈমান ও তাওহীদের দাবি নিরর্থক। এরপর বলা হয়—ذٰلِكَ قَوْلُهُمْ بِاَفْوَاهِهِمْ 'এটি তাদের মুখের কথা।' এ বাক্যের দুটি অর্থ হতে পারে। প্রথম, তারা নিজেদের ভ্রান্ত আকীদার কথা নিজ মুখেও স্বীকার করে। এতে গোপনীয়তা কিছুই নেই। দুই, তারা মুখে যে কুফরী উক্তি

করে যাচ্ছে তার পেছনে না কোন দলীল আছে, না কোন যুক্তি। অতপর বলা হয়ঃ يُضَاهِـُٔوْنَ قَوْلَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَبْلُ ۚ قَاتَلَهُمُ اللّٰهُ ۚ اَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ

"এরা পূর্ববর্তী কাফিরদের মত কথা বলে, আল্লাহ্ এদের ধ্বংস করুন। ওরা কোন উল্টা পথে চলে যাচ্ছে।" এতে অর্থ হল ইহুদী ও খৃস্টানরা নবীদের আল্লাহ্‌র পুত্র বলে পূর্ববর্তী কাফির ও মুশরিকদের মতই হয়ে গেল, তারা ফেরেশতা ও লাত-মানাত মূর্তিদ্বয়কে আল্লাহ্‌র কন্যা সাব্যস্ত করেছিল।

اِتَّخَذُوْٓا اَحْبَارَهُمْ وَ رُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ
وَالْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ ۚ وَمَآ اُمِرُوْٓا اِلَّا لِيَعْبُدُوْٓا اِلٰهًا وَّاحِدًا ۚ
لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ سُبْحٰنَهٗ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿٣١﴾ يُرِيْدُوْنَ اَنْ يُّطْفِـُٔوْا نُوْرَ اللّٰهِ
بِاَفْوَاهِهِمْ وَيَاْبَى اللّٰهُ اِلَّآ اَنْ يُّتِمَّ نُوْرَهٗ وَلَوْ كَرِهَ الْكٰفِرُوْنَ ﴿٣٢﴾
هُوَ الَّذِيْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى
الدِّيْنِ كُلِّهٖ ۙ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ ﴿٣٣﴾ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّ
كَثِيْرًا مِّنَ الْاَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ
وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۗ وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَ
الْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۙ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ﴿٣٤﴾
يَّوْمَ يُحْمٰى عَلَيْهَا فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوٰى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوْبُهُمْ
وَظُهُوْرُهُمْ ۗ هٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِاَنْفُسِكُمْ فَذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ
تَكْنِزُوْنَ ﴿٣٥﴾

(৩১) তারা তাদের পণ্ডিত ও সংসার-বিরাগীদের তাদের পালনকর্তারূপে গ্রহণ করেছে আল্লাহ্ ব্যতীত এবং মরিয়মের পুত্রকেও। অথচ তারা আদিষ্ট ছিল একমাত্র মাবুদের ইবাদতের জন্য। তিনি ছাড়া কোন মাবুদ নেই, তারা তাঁর শরীক সাব্যস্ত করে, তার থেকে তিনি পবিত্র! (৩২) তারা তাদের মুখের ফুৎকারে আল্লাহ্‌র নূরকে

নির্বাপিত করতে চায়। কিন্তু আল্লাহ্ অবশ্যই তার নূরের পূর্ণতা বিধান করবেন—যদিও কাফিররা তা অপ্রীতিকর মনে করে। (৩৩) তিনিই প্রেরণ করেছেন আপন রসূলকে হেদায়েত ও সত্য দীন সহকারে যেন এ দ্বীনকে অপরাপর দ্বীনের উপর জয়যুক্ত করেন যদিও মুশরিকরা তা অপ্রীতিকর মনে করে। (৩৪) হে ঈমানদারগণ! পণ্ডিত ও সংসার বিরাগীদের অনেকে লোকদের মালামাল অন্যায়ভাবে ভোগ করে চলছে এবং আল্লাহ্র পথ থেকে লোকদের নিবৃত্ত রাখছে। আর যারা স্বর্ণ ও রূপা জমা করে রাখে এবং তা ব্যয় করে না আল্লাহ্র পথে, তাদের কঠোর আযাবের সুসংবাদ শুনিয়ে দিন। (৩৫) সে দিন জাহান্নামের আগুনে তা উত্তপ্ত করা হবে এবং তার দ্বারা তাদের ললাট, পার্শ্ব ও পৃষ্ঠদেশকে দগ্ধ করা হবে (সেদিন বলা হবে) এগুলো যা তোমরা নিজেদের জন্য জমা রেখেছিলে, সুতরাং এক্ষণে আস্বাদ গ্রহণ কর জমা করে রাখার।"

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(কুফরী আচরণের বিবরণ দিয়ে বলা হচ্ছে) তারা (ইহুদী ও খৃস্টানরা তাদের পণ্ডিত ও সংসার-বিরাগীদের আনুগত্যের দিক দিয়ে) তাদের পালনকর্তারূপে গ্রহণ করেছে (এই রূপে যে, তারা হালাল ও হারামের ক্ষেত্রে আল্লাহ্র আনুগত্যের মত এদের আনুগত্য করে। এমন কি অনেক ক্ষেত্রে আল্লাহ্র আদেশের উপর এদের আদেশকে প্রাধান্য দেয়। এ ধরনের আনুগত্যই হল ইবাদত। এ দৃষ্টিকোণে তারা পীর পুরোহিতদের ইবাদত করে চলছে) এবং মরিয়মের পুত্র ঈসাকেও (এক হিসেবে মাবুদ সাব্যস্ত করে রেখেছে। কারণ, তাদের দৃষ্টিতে তিনি আল্লাহ্র পুত্র। পুত্র হলে আল্লাহ্ তাঁর মাঝেও সঞ্চারিত হওয়া আবশ্যক) অথচ তাঁরা (আসমানী কিতাব দ্বারা) আদিষ্ট ছিলেন একমাত্র মাবুদ (বরহক)-এর ইবাদত করবে, তিনি ছাড়া আর কেউ মাবুদ নেই। তিনি তাদের শির্ক থেকে কতই না পবিত্র! (এ হল তাদের বাতিল পথ অবলম্বনের বিবরণ। সামনে তাদের আরেক কুফরীর বর্ণনা দেওয়া হচ্ছে যে, তারা সত্য দীনকে নিশ্চিহ্ন করতে চায়। বলা হয়,) তার মুখের ফুৎকারে আল্লাহ্র নূর (দীন-ইসলাম)-কে নির্বাপিত করতে চায় (অর্থাৎ নানা আপত্তি ও ব্যঙ্গোক্তি দ্বারা ইসলামের প্রসার রোধ করতে চায়) কিন্তু আল্লাহ্ অবশ্যই তাঁর নূরের পূর্ণ বিকাশ ব্যতীত নিরস্ত হবেন না। যদিও কাফিররা (এতে কিতাবীগণও এসে গেল) তা অপ্রীতিকর মনে করুক। তিনিই প্রেরণ করেছেন আপন রসূল (মুহাম্মদ)-কে হিদায়ত (-এর উপকরণ অর্থাৎ কোরআন) ও সত্য দীন (ইসলাম) সহকারে, যাতে তিনি এই দীনকে অপরাপর (সকল) দীনের উপর জয়যুক্ত করেন। (এ হল আপন নূরের পূর্ণ বিকাশ) যদিও মুশরিকরা (ইহুদী খৃস্টানসহ) তা অপ্রীতিকর মনে করুক। হে ঈমানদারগণ, (ইহুদী-খৃস্টানেরা পণ্ডিত ও সংসার বিরাগীদের অনেক লোকদের মালামাল অন্যায়ভাবে ভোগ করে চলছে (অর্থাৎ শরীয়তের প্রকৃত হুকুমকে গোপন করে সাধারণ লোকের মর্জিমত ফতোয়া দিয়ে ওরা পয়সা রোজগারে ব্যস্ত) এবং এর দ্বারা তারা আল্লাহ্র পথ (ইসলাম) থেকে লোকদের নিবৃত্ত রাখছে (অর্থাৎ তাদের মিথ্যা ফতোয়ার ধোঁকায় পড়ে মানুষ অধিকতর বিভ্রান্ত

হচ্ছে যার ফলে সত্য গ্রহণ এমনকি সত্যের অন্বেষণেও নিস্পৃহ)। আর (তারা কঠিন লোভে পড়ে অর্থ জমা করতেও ব্যস্ত। যার সাজা হল) যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য জমা করে এবং তা ব্যয় করে না আল্লাহ্‌র পথে (অর্থাৎ যাকাত আদায় করে না। হে রসূল, আপনি) তাদের কঠোর আযাবের সুসংবাদ দিন। (সে আযাব ভোগ করতে হবে সেদিন) তা জাহান্নামের আগুনে (প্রথমে উত্তপ্ত করা হবে এবং (পরে) তার দ্বারা তাদের ললাট, পার্শ্ব ও পৃষ্ঠদেশকে দগ্ধ করা হবে (এবং বলা হবে) এগুলো তাই যা তোমরা নিজেদের জন্য জমা রেখেছিলে সুতরাং এক্ষণে আস্বাদ গ্রহণ কর যা জমা করে রেখেছিলে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

উপরোক্ত আয়াত চতুষ্টয়ে ইহুদী-খৃস্টান আলিম ও পীর-পুরোহিতদের কুফরী উক্তি ও আমলের বিবরণ রয়েছে। حبر - احبار এর এবং راهب - رهبان এ বহুবচন। حبر ইহুদী ও খৃস্টানদের আলিমকে এবং راهب তাদের সংসার বিরাগী-দেরকে বলা হয়।

প্রথম আয়াতে বলা হয় যে, ইহুদী খৃস্টানরা তাদের আলিম ও যাজক শ্রেণীকে আল্লাহ্‌র পরিবর্তে প্রতিপালক ও মাবুদ সাব্যস্ত করে রেখেছে। অনুরূপ হযরত ঈসা (আ)-কেও মাবুদ মনে করে। তাঁকে আল্লাহ্‌র পুত্র মনে করায় তাঁকে মাবুদ বানানোর বিষয়টি তো পরিষ্কার, তবে আলিম ও যাজক শ্রেণীকে মাবুদ সাব্যস্ত করার দোষে যে দোষী করা হয়, তার কারণ হল, তারা পরিষ্কার ভাষায় ওদের মাবুদ না বললেও পূর্ণ আনুগত্যের যে হক বান্দার প্রতি আল্লাহ্‌র রয়েছে, তাকে তারা যাজক শ্রেণীর জন্য উৎসর্গ রাখে। অর্থাৎ তারা সর্বাবস্থায় যাজক শ্রেণীর আনুগত্য করে চলে; তা আল্লাহ্‌ রসূলের যতই বরখেলাফ হোক না কেন? বলা বাহুল্য, পীর পুরোহিতগণের আল্লাহ রসূল বিরোধী উক্তি ও আমলের আনুগত্য করা তাদেরকে মাবুদ সাব্যস্ত করার নামা-ন্তর। আর এটি হল প্রকাশ্য কুফরী।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, শরীয়তের মাসায়েল সম্পর্কে অজ্ঞ জনসাধারণের পক্ষে ওলামায়ে-কিরামের ফতোয়ার অনুসরণ বা ইজতিহাদী মাসায়েলের ক্ষেত্রে মুজতাহির ইমামদের মতামতের অনুসরণ-এর সাথে অত্র আয়াতের কোন সম্পর্ক নেই। কারণ, এঁদের অনুসরণ হল প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌-রসূলেরই আনুগত্য। এর তাৎপর্য হল, ইমাম ও আলিমরা আল্লাহ্‌-রসূলের আদেশ নির্দেশকে সরাসরি বিশ্লেষণ করে তার উপর আমল করেন। আর জনসাধারণ আলিমদের জিজ্ঞেস করে—তারপর সেমতে আমল করেন। যে ওলামায়ে কিরামের ইজতিহাদী ক্ষমতা নেই তারাও ইজতিহাদী মাসায়েলের ক্ষেত্রে মুজতাহিদ ইমামদের পায়রবী করেন। এই পায়রবী হল কোরআনের নির্দেশক্রমে, কাজেই তা মূলত আল্লাহ্‌রই পায়রবী। কোরআনে ইরশাদ হয়ঃ

فَسْئَلُوْٓا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ অর্থাৎ তোমরা যদি আল্লাহ্ ও রসূলের হুকুম-আহ্কাম সম্পর্কে ওয়াকিফহাল না হও তবে বিজ্ঞ আলিমদের কাছে জিজ্ঞেস কর।

পক্ষান্তরে ইহুদী খৃস্টানরা আল্লাহ্র কিতাব এবং আল্লাহ্র রসূলের আদেশ নিষেধকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে স্বার্থপর আলিম এবং অজ্ঞ পুরোহিতদের কথা ও কর্মকে যে নিজেদের ধর্ম বানিয়ে নিয়েছে, তারই নিন্দা জ্ঞাপন করা হয় অত্র আয়াতে। অতপর বলা হয়, 'এই গোমরাহী অবলম্বন করেছে বটে কিন্তু আল্লাহ্র আদেশ হল একমাত্র তাঁর ইবদত করার এবং তিনি তাদের শিরকী কার্যকলাপ থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র"।

ইহুদী খৃস্টানদের এহেন বাতিল পথের অনুসরণ এবং গায়রুল্লাহ্র অবৈধ আনুগত্যের বিবরণ দিয়ে এ আয়াতটি শেষ করা হয়। পরবর্তী আয়াতে বলা হয় যে, তারা গোমরাহী করেই ক্ষান্ত হচ্ছে না বরং আল্লাহর সত্য দীনকে নিশ্চিহ্ন করারও ব্যর্থ প্রয়াস চালাচ্ছে। আয়াতে উপমা দিয়ে বলা হচ্ছে যে, এরা মুখের ফুৎকারে আল্লাহ্র নূরকে নিভিয়ে দিতে চায়। অথচ এটি তাদের জন্য অসম্ভব। বরং আল্লাহ্র অমোঘ ফয়সালা যে, তিনি নিজের নূর তথা দীনে ইসলামকে পূর্ণরূপে উদ্ভাসিত করবেন, তা কাফির ও মুশরিকদের যতই মর্মপীড়ার কারণ হোক না কেন?

এরপর তৃতীয় আয়াতের সারকথাও এটাই যে, আল্লাহ্ আপন রসূলকে হিদায়েতের উপকরণ—কোরআন এবং সত্য দীন-ইসলাম সহকারে এজন্য প্রেরণ করেছেন, যাতে অপরাপর ধর্মের উপর ইসলাম ধর্মের বিজয় সূচীত হয়। এ মর্মে আরও কতিপয় আয়াত কোরআনে রয়েছে যাতে সকল ধর্মের উপর ইসলাম ধর্মের বিজয় লাভের প্রতিশ্রুতি রয়েছে।

তফসীরে মাযহারীতে উল্লেখ আছে যে, অন্যান্য দীনের উপর দীনে-ইসলামের বিজয় লাভের সুসংবাদগুলো অধিকাংশ অবস্থা ও কালানুপাতি যেমন, হযরত মিক্দাদ (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেছেনঃ "এমন কোন কাঁচা ও পাকা ঘর দুনিয়ার বুকে থাকবে না, যেখানে ইসলামের প্রবেশ ঘটবে না। সম্মানীদের সম্মানের সাথে এবং লাঞ্ছিতদের লাঞ্ছনার সাথে, আল্লাহ্ যাদের সম্মানিত করবেন তারা ইসলাম কবুল করবে এবং যাদের লাঞ্ছিত করবেন তারা ইসলাম গ্রহণে বিমুখ থাকবে, কিন্তু ইসলামী রাষ্ট্রের অনুগত প্রজায় পরিণত হবে।" আল্লাহ্র এই প্রতিশ্রুতি অচিরেই পূর্ণ হয়। যার ফলে গোটা দুনিয়ার উপর প্রায় এক হাজার বছর যাবত ইসলামের প্রভুত্ব বিস্তৃত থাকে।

রসূলে-করীম (সা) ও সলফে-সালেহীনের পবিত্র যুগে আল্লাহ্র নূরের পূর্ণ বিকাশের দৃশ্য গোটা দুনিয়া প্রত্যক্ষ করেছে। ভবিষ্যতের জন্যও দীন-ইসলাম দলীল-প্রমাণ ও মৌলিকতার দিক দিয়ে এমন এক পূর্ণাঙ্গ ধর্ম যার খুঁত ধরার সুযোগ কোন বিবেকবান মানুষের হবে না। তাই কাফিরদের শত বিরোধিতা সত্ত্বেও এই দীন দলীল-প্রমাণে চির ভাস্বর। এ জন্য মুসলমানরা যতদিন ইসলামের পূর্ণ অনুগত থাকবে, ততদিন

তাদের শৌর্য বীর্য ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ থাকবে। ইতিহাসের সাক্ষ্যও তাই। মুসলমানরা যতদিন কোরআন ও হাদীসের পূর্ণ অনুগত ছিল, ততদিন পাহাড় কি সমুদ্র কোনটাই তাদের অগ্রযাত্রাকে ব্যাহত করতে পারেনি। এভাবে গোটা দুনিয়ার কর্তৃত্ব একদিন তাদের হাতে এসে গিয়েছিল। কিন্তু যেখানে মুসলমানরা পরাভূত ও হীনবল হয়ে পড়েছিল, অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে যে, সেই বিপর্যয়ের মূলে ছিল কোরআন-হাদীসের বিরুদ্ধাচরণ এবং তৎপ্রতি অবহেলা। কিন্তু এ দুর্গতি মুসলমানদের, ইসলামের নয়। ইসলাম আপন জ্যোতিতে সদা ভাস্বর।

চতুর্থ আয়াতে মুসলমানদের সম্বোধন করে ইহুদী-খৃস্টান পীর-পুরোহিতদের এমন কুকীর্তির বর্ণনা দেওয়া হয়, যা লোকসমাজে গোমরাহী প্রসারের অন্যতম কারণ। ইহুদী-খৃস্টানের আলোচনায় মুসলমানদের হয়ত এ উদ্দেশ্যে সম্বোধন করা হয় যে, তাদের অবস্থাও যেন ওদের মত না হয় আয়াতে ইহুদী খৃস্টান পীর-পুরোহিতদের অধিকাংশ সম্পর্কে বলা হয় যে, তারা গর্হিত পন্থায় লোকদের মালামাল গলধঃকরণ করে চলছে এবং আল্লাহ্‌র সরল পথ থেকে মানুষকে নিবৃত্ত রাখছে।

অধিকাংশ পীর-পুরোহিতের যেখানে এ অবস্থা সেখানে সাধারণত সমকালীন সবাইকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়। কিন্তু কোরআন মজীদ তা না করে كَثِيرًا (অধিকাংশ) শব্দ প্রয়োগ করেছে। এর দ্বারা মুসলমানদের শিক্ষা দেওয়া উদ্দেশ্য যে, তারা যেন শত্রুর বেলায়ও কোনরূপ বাড়াবাড়ির আশ্রয় না নেয়।

গর্হিত পন্থায় মানুষের সম্পদ ভোগের অর্থ হল, অনেক সময় তারা পয়সা নিয়ে তাওরাতের শিক্ষাবিরোধী ফতোয়া দান করত। আবার কখনো তাওরাতের বিধি-নিষেধকে গোপন রেখে কিংবা তাতে নানা হীলা-বাহানা সৃষ্টি করে জ্ঞানপাপীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হতো। তাদের বড় অপরাধ হল যে, তারা নিজেরাই শুধু পথভ্রষ্ট নয়, বরং সত্যপথ অন্বেষণকারীদের বিভ্রান্ত হওয়ারও কারণ হয়ে দাঁড়াতো। কেননা, যেখানে নেতাদের এ অবস্থা, সেখানে অনুসারীদের সত্য সন্ধানের স্পৃহাও আর বাকী থাকে না। তাছাড়া, পীর-পুরোহিতদের বাতিল ফতোয়ার দরুন সরল জনগণ মিথ্যাকেও সত্যরূপে বিশ্বাস করে নেয়।

ইহুদী-খৃস্টান আলিম সম্প্রদায়ের মিথ্যা ফতোয়া দানের ব্যাধি সৃষ্টি হয় অর্থের লোভ-লালসা থেকে। এ জন্য আয়াতে বর্ণিত অর্থ লিপ্সার করুণ পরিণতি ও কঠোর সাজা এবং এ ব্যাধি থেকে পরিত্রাণ লাভের উপায় বর্ণিত হয়। ইরশাদ হয়েছেঃ

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

অর্থাৎ যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য জমা করে রাখে, তা খরচ করে না আল্লাহ্‌র পথে, তাদের কঠোর আযাবের সুসংবাদ দিন।"

"আর তা খরচ করে না আল্লাহ্‌র পথে" বাক্য থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, যারা বিধান মতে আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে খরচ করে, তাদের পক্ষে তাদের অবশিষ্ট অর্থসম্পদ ক্ষতিকর নয়। হাদীস শরীফে রসূলে করীম (সা) ইরশাদ করেছেনঃ "যে মালামালের যাকাত দেওয়া হয়, তা জমা রাখা সঞ্চিত ধনরত্নের শামিল নয়।" —(আবূ দাউদ, আহমদ)। এ থেকে বোঝা যায় যে, যাকাত আদায়ের পর যা অবশিষ্ট থাকে, তা জমা রাখা গুনাহ নয়। অধিকাংশ ফকীহ ও ইমাম এ মতের অনুসারী।

و لا ينفقو نها "আর তা খরচ করে না" বাক্যের 'তা' সর্বনামের উদ্দিষ্ট বস্তু হল রৌপ্য। অথচ, আয়াতে স্বর্ণ ও রৌপ্য উভয়েরই উল্লেখ রয়েছে। তফসীরে মাযহারীর মতে এ বর্ণনাভঙ্গিতে এ ইঙ্গিত রয়েছে যে, যার অল্প পরিমাণ স্বর্ণ ও রৌপ্য রয়েছে, সে যাকাত প্রদানের বেলায় স্বর্ণকে রূপার মূল্যের সাথে যোগ করে রূপার হিসাব মতে যাকাত প্রদান করবে।

শেষের আয়াতে জমাকৃত স্বর্ণ ও রৌপ্যকে জাহান্নামের আগুনে উত্তপ্ত করে ললাট, পার্শ্ব ও পৃষ্ঠদেশ দগ্ধ করার যে কঠোর সাজার উল্লেখ রয়েছে, তা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, স্বয়ংকৃত আমলই সে আমলের সাজা।

অর্থাৎ যে অর্থসম্পদ অবৈধ পন্থায় জমা করা হয়, কিংবা বৈধ পন্থায় জমা করলেও তার যাকাত আদায় করা না হয়, সে সম্পদই তার জন্য আযাবের রূপ ধারণ করে।

এ আয়াতে যে ললাট, পার্শ্ব ও পৃষ্ঠদেশ দগ্ধ করার উল্লেখ রয়েছে, তার অর্থ সমগ্র শরীরও হতে পারে। কিংবা এই তিন অঙ্গের উল্লেখ এজন্য করা হয়েছে যে, যে কৃপণ ব্যক্তি আল্লাহ্‌র রাহে খরচ করতে চায় না, তার কাছে যখন কোন ভিক্ষুক কিছু চায়, কিংবা যাকাত তলব করে, তখন সে প্রথমে ভ্রূকুঞ্চন করে, তারপর পাশ কাটিয়ে তাকে এড়িয়ে যেতে চায়। এতেও সে ক্ষান্ত না হলে তাকে পৃষ্ঠ দেখিয়ে চলে যায়। এজন্য বিশেষ করে এ তিন অঙ্গে আযাব দানের উল্লেখ করা হয়।

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتٰبِ اللَّهِ يَوْمَ
خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ۚ ذٰلِكَ الدِّينُ
الْقَيِّمُ ۙ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ ۚ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ
كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿٣٦﴾
إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ
عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ
اللَّهُ ۚ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ ۚ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكٰفِرِينَ ﴿٣٧﴾ ع

(৩৬) নিশ্চয় আল্লাহ্‌র বিধান ও গণনায় মাস বারটি, আসমানসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টির দিন থেকে। তন্মধ্যে চারটি সম্মানিত। এটিই সুপ্রতিষ্ঠিত বিধান; সুতরাং এর মধ্যে তোমরা নিজেদের প্রতি অত্যাচার করো না। আর মুশরিকদের সাথে তোমরা যুদ্ধ কর সমবেতভাবে, যেমন তারাও তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে যাচ্ছে সমবেতভাবে। আর মনে রেখ, আল্লাহ্ মুত্তাকীদের সাথে রয়েছেন। (৩৭) এই মাস পিছিয়ে দেওয়ার কাজ কেবল কুফরীর মাত্রা বৃদ্ধি করে, যার ফলে কাফিরগণ গোমরাহীতে পতিত হয়। এরা হালাল করে নেয় একে এক বছর এবং হারাম করে নেয় অন্য বছর, যাতে তারা গণনা পূর্ণ করে নেয় আল্লাহ্‌র নিষিদ্ধ মাসগুলোর। অতপর হালাল করে নেয় আল্লাহ্‌র হারামকৃত মাসগুলোকে। তাদের মন্দ কাজগুলো তাদের জন্য শোভনীয় করে দেওয়া হল। আর আল্লাহ কাফির সম্প্রদায়কে হিদায়েত করেন না।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

নিশ্চয় আল্লাহ্‌র বিধানে (শরীয়তে) আল্লাহ্‌র নিকট মাস গণনায় (গ্রহণযোগ্য চান্দ্রমাস হল) বারটি---(এ হিসাব আজ থেকে নয়, বরং) আসমানসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টির দিন থেকে (চলে আসছে)। তন্মধ্যে (বিশেষভাবে) চারটি মাস সম্মানিত--- (তা' হল জিলকদ, জিলহজ্জ, মুহাররম ও রজব), এটিই প্রতিষ্ঠিত ধর্ম বিধান। (অর্থাৎ মাস বারটি হওয়া এবং তন্মধ্যে চারটি বিশেষ মাস নিষিদ্ধ হওয়া। পক্ষান্তরে জাহেলী প্রথা অনুসারে কখনো বর্ষ-শুমারীতে মাসের সংখ্যা বৃদ্ধি করা, আবার কখনো নিষিদ্ধ মাসের সম্মান পরিহার করে চলা হল আল্লাহ্‌র ধর্ম বিধানের অমান্যতা।) সুতরাং তোমরা এর মধ্যে (আল্লাহ্‌র বিধান লংঘন করে) নিজেদের প্রতি ক্ষতি করো না। (অর্থাৎ জাহেলী প্রথা পালন করে নিজেদের ক্ষতিগ্রস্ত করো না।) আর তোমরা যুদ্ধ কর মুশরিকদের সাথে (যারা কুফরীতে এ ধরনের অপকর্মে লিপ্ত রয়েছে) সমবেতভাবে যেমন তারাও তোমাদের সাথে (সর্ব ক্ষণ) যুদ্ধ (প্রস্তুতি) চালিয়ে যাচ্ছে। আর (যদি তাদের সংখ্যাধিক্য ও অস্ত্রশস্ত্রে শঙ্কিত হও, তবে) মনে রেখ, আল্লাহ্ মুত্তাকীদের সাথে রয়েছেন। (সুতরাং ঈমান ও তাক্ওয়া দৃঢ়রূপে অবলম্বন করে থাক এবং কাউকে ভয় করো না। সামনে মুশরিকদের জাহেলী অভ্যাসের বর্ণনা দেওয়া হচ্ছে যে,) নিষিদ্ধ কাল (কিংবা এর হুরমতকে অন্য মাসে পিছিয়ে দেওয়া কেবল কুফরীর মাত্রাই বৃদ্ধি করে যার ফলে (সাধারণ) কাফিরগণ (-ও) গোমরাহীতে পতিত হয় (এভাবে যে) এরা (স্বার্থসিদ্ধির জন্য) এতে হালাল করে নেয় এক বছর এবং (কোন উদ্দেশ্য না থাকলে) হারাম করে নেয় অন্য বছর, যাতে গণনা পূর্ণ করে নেয় (আল্লাহর নির্দিষ্ট করণ ও নির্ধারণের প্রতি লক্ষ্য না করে) আল্লাহর নিষিদ্ধ মাসগুলোর। (অতপর নির্ধারণ ও ও নির্দিষ্টকরণ যখন নাই থাকল, তখন) হালাল করে নেয় আল্লাহ্‌র নিষিদ্ধ মাসগুলোকে। তাদের মন্দ কাজসমূহ তাদের জন্য শোভনীয় করে দেওয়া হল, আর (তাদের কুফরী ও হঠকারিতার জন্য দুঃখ করা বৃথা। কারণ,) আল্লাহ্ কাফির সম্প্রদায়কে হিদায়েত (-এর তওফীক দান) করেন না। কেননা, এরা স্বয়ং সরল পথে আসতে চায় না।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে কাফির ও মুশরিকদের কুফর ও শিরক এবং গোমরাহী ও অপকর্মসমূহের বিবরণ ছিল। আলোচ্য আয়াতদ্বয় এ প্রসঙ্গে একটি বিষয়, জাহেলী যুগের এক কুপ্রথার বর্ণনা এবং এর থেকে সাবধানতা অবলম্বনের জন্য মুসলমানদের তাগিদ দেওয়া হয়। যার বিবরণ হল এই যে, প্রাচীন কাল থেকে পূর্ববর্তী সকল নবীর শরীয়তসমূহে বার চান্দ্রমাসকে এক বছর গণনা করা হত এবং তন্মধ্যে চারটি মাস যিলকদ, যিলহজ্জ, মুহররম ও রজব মাসকে বড়ই বরকতময় ও সম্মানিত মনে করা হত।

সকল নবীর শরীয়ত এ ব্যাপারে একমত যে, এ চার মাসে যে কোন ইবাদতের সওয়াব বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। তেমনি এ সময়ে পাপাচার করলে তার পরিণাম এবং আযাবও কঠোরভাবে ভোগ করতে হবে। পূর্ববর্তী শরীয়তসমূহে এ চার মাসে যুদ্ধ-বিগ্রহও নিষিদ্ধ ছিল।

মক্কার অধিবাসী আরবগণ ছিল হযরত ইসমাঈল (আ)-এর মাধ্যমে হযরত ইব্রাহীম (আ)-এর নবুয়তের প্রতি বিশ্বাসী ও তাঁর শরীয়ত অনুসরণের দাবীদার। বলা বাহুল্য, ইব্রাহীমী শরীয়ত মতেও এ মাসগুলোতে যুদ্ধ-বিগ্রহ এমনকি জন্তু শিকারও ছিল নিষিদ্ধ। কিন্তু যুদ্ধ-বিগ্রহ ও দাঙ্গা-হাঙ্গামা জাহেলী যুগে আরববাসীদের স্বভাবে পরিণত হওয়ার উপরোক্ত হুকুম তামিল করা ছিল তাদের জন্য বড়ই দুষ্কর। তাই তার স্বার্থসিদ্ধির জন্য নানা টালবাহানার আশ্রয় নিত। কখনো এ মাসগুলোতে যুদ্ধ-বিগ্রহের মনস্থ করলে, কিংবা যুদ্ধের সিলসিলা নিষিদ্ধ মাসেও প্রসারিত হলে তারা বলত, বর্তমান বছরে এ মাস নিষিদ্ধ নয়, আগামী মাস থেকেই নিষিদ্ধ মাসের শুরু। যেমন, যুদ্ধ চলাকালে মুহররম মাস এসে পড়লে বলত, এ বছরের মুহররম নিষিদ্ধ মাস নয়, বরং তা' হবে সফর বা রবিউল আউয়াল মাস। অথবা বলত, এ বছরের প্রথম মাস হল সফর, মুহররম হবে দ্বিতীয়। সারকথা, আল্লাহ্র চিরাচরিত নিয়মের বিরুদ্ধে বছরের যে কোন চার মাসকে তাদের সুবিধা মত নিষিদ্ধরূপে গণ্য করে নিত। যে মাসকে ইচ্ছা, যিলহজ্ব বা রমযান নামে অভিহিত করত। এমনকি অনেক সময় যুদ্ধ-বিগ্রহে দশটি মাস অতিবাহিত হলে বর্ষপূর্তির জন্য আরও কয়টি মাস বাড়িয়ে দিয়ে বলত—এ বছরটি হবে চৌদ্দ মাস সম্বলিত। অতপর অতিরিক্ত চার মাসকে সে বছরের নিষিদ্ধ মাসরূপে গণ্য করত।

সারকথা, দীনে ইব্রাহীমীর প্রতি তাদের এতটুকু শ্রদ্ধাবোধ ছিল যে, বছরের চারটি মাসের হুরমত অনুধাবন করে তাতে যুদ্ধ-বিগ্রহ থেকে বিরত থাকত। কিন্তু আল্লাহ্ মাসের যে ধারাবাহিকতা নির্ধারিত রেখেছেন এবং সে মতে যে চার মাসকে নিষিদ্ধ করেছেন, তাতে নানা হেরফের করে তারা নিজেদের স্বার্থ পূরণ করে নিত। ফলে সে সময় কোন্ মাস প্রকৃত রমযান বা শাওয়ালের এবং কোন্ মাস জিলকদ বা রজবের তা নির্ধারণ করা দুষ্কর হয়ে পড়েছিল। অষ্টম হিজরী সালে যখন মক্কা বিজিত হয় এবং নবম সালে রসূলে করীম (সা) হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-কে হজ্জের মৌসুমে

কাফিরদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ ঘোষণার জন্য প্রেরণ করছিলেন, সে মাসটি প্রকৃত প্রস্তাবে যদিও ছিল যিলহজ্বের কিন্তু জাহেলী যুগের সেই পুরাতন প্রথানুসারে তা জিলকদই সাব্যস্ত হল এবং সে মতে তাদের কাছে সে বছরের হজ্বের মাস ছিল যিলহজ্বের স্থলে জিলকদ। অতপর দশম হিজরী সালে যখন নবী করীম (সা) বিদায় হজ্বের জন্য মক্কায় আগমন করেন, তখন অবলীলাক্রমে এমন ব্যবস্থাও হয়ে যায় যে, প্রকৃত যিলহজ্ব জাহেলী হিসাব মতেও যিলহজ্বেই সাব্যস্ত নয়। সেজন্য রসূলে করীম (সা) মিনা প্রান্তরে প্রদত্ত খুতবায় ইরশাদ করেছিলেনঃ الا ان الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق الله السموات والارض অর্থাৎ "কালের চক্র ঘুরে-ফিরে সেই নিয়মের উপর এসে গেল, যার উপর আল্লাহ্ আসমান ও যমীনের সৃষ্টি করেছিলেন।" অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষে যে মাসটি যিলহজ্ব, তা জাহেলী প্রথানুসারেও যিলহজ্বই সাব্যস্ত হল।

জাহেলী প্রথায় মাস গণনার এই রদবদল ও বিনিময়, তার ফলে কোন মাস বা দিন বিশেষের সাথে সম্পৃক্ত ইবাদত ও শরীয়তের হুকুম-আহকাম পালনেও বিস্তর জটিলতা সৃষ্টি হত। যেমন, যিলহজ্বের প্রথম দশকে রয়েছে হজ্বের আহকাম, দশই মুহররমের রোযা এবং বছরের শেষে যাকাত আদায়ের হুকুম প্রভৃতি।

মাসের নাম পরিবর্তন ও অদল বদল---যথা, মুহররমের সফর ও সফরের মুহাররম নামকরণ প্রভৃতি বাহ্যত বড় কিছু নয়; কিন্তু এর ফলে শরীয়তের অসংখ্য হুকুমের বিকৃতি ঘটে আমল যে নষ্ট হয়ে যায় তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তাই আলোচ্য প্রথম দু'আয়াতে সেই জাহেলী প্রথার মন্দ দিকের উল্লেখ করে তৎপ্রতি মুসলমানদেরকে সাবধানতা অবলম্বনের তাগিদ করা হয়।

প্রথম আয়াতে ইরশাদ হয়েছেঃ اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُوْرِ عِنْدَ اللّٰهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا

"নিশ্চয় আল্লাহ্র নিকট মাস-গণনায় মাস হল বারটি।" এখানে উল্লিখিত عدة অর্থ গণনা। شهور হল شهر-এর বহুবচন। অর্থাৎ মাস। বাক্যের সারমর্ম হল আল্লাহ্র কাছে মাসের সংখ্যা বারটি নির্ধারিত; এতে কম বেশি কারো ক্ষমতা নেই।

অতপর كتاب الله বলে স্পষ্ট করা হয় যে, বিষয়টি রোজে আযল অর্থাৎ সৃষ্টির প্রথম দিনেই লাউহে-মাহফূযে লিখিত রয়েছে। এরপর يَوْمَ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ বলে ইঙ্গিত করা হয় যে, রোজে আযলে এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়া হলেও মাসগুলোরও ধারাবাহিকতা নির্ধারণ হয়। আসমান ও যমীনের সৃষ্টি পরবর্তী মুহূর্তে।

তারপর বলা হয় مِنْهَا اَرْبَعَةٌ حُرُمٌ অর্থাৎ তন্মধ্যে চার মাস হল নিষিদ্ধ।

সেহেতু এ চার মাস যুদ্ধ-বিগ্রহ ও রক্তপাত হারাম। অর্থ হল, এই চারটি মাস সম্মানিত, যেহেতু মাসগুলো অতীব বরকতময়। এতে ইবাদতের সওয়াব বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। প্রথম অর্থ মতে যে হুকুম, তা' ইসলামী শরীয়তে রহিত। তবে দ্বিতীয় অর্থ মতে আদব ও সম্মান প্রদর্শন এবং ইবাদতে যত্নবান হওয়ার হুকুমটি ইসলামেও বাকী রয়েছে।

বিদায় হজ্বের সময় মিনা প্রান্তরে প্রদত্ত খুতবায় নবী করীম (সা) সম্মানিত মাসগুলোকে চিহ্নিত করে বলেন, "তিনটি মাস হল ধারাবাহিক—জিলকদ, যিলহজ্ব ও মুহররম, অপরটি হল রজব। তবে রজব সম্পর্কে আরববাসীদের দ্বিমত রয়েছে। কতিপয় গোত্রের মতে রজব হল রমযান। আর মুযার গোত্রের ধারণা মতে রজব হল জুমাদিউস-সানী ও শা'বানের মধ্যবর্তী মাসটি। তাই নবী করীম (সা) খুতবায় মুযার গোত্রের রজব বলে বিষয়টি পরিষ্কার করে দেন।

ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ "এটিই হল সুপ্রতিষ্ঠিত বিধান।" অর্থাৎ মাসগুলোর ধারাবাহিকতা নির্ধারণ এবং সম্মানিত মাসগুলোর সাথে সম্পৃক্ত হুকুম-আহকামকে সৃষ্টির প্রথম পর্বের এলাহী নিয়মের সাথে সঙ্গতিশীল রাখাই হল দীনে-মুসতাকীম। এতে কোন মানুষের কম বেশী কিংবা পরিবর্তন পরিবর্ধন করার প্রয়াস অসুস্থ বিবেক ও মন্দ স্বভাবের আলামত।

فَلَا تَظْلِمُوْا فِيْهِنَّ اَنْفُسَكُمْ "সুতরাং তোমরা এ মাসগুলোতে নিজেদের প্রতি অবিচার করো না" অর্থাৎ এ পবিত্র মাসগুলোর যথাযথ আদব রক্ষা না করে এবং ইবাদত বন্দেগীতে অলস থেকে নিজেদের ক্ষতি করো না।

ইমাম জাস্‌সাস (র) 'আহ্‌কামুল কোরআন' গ্রন্থে বলেন, কোরআনের এ বাক্য থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, এ মাসগুলোর এমন বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যার ফলে এতে ইবাদত করা হলে বাকী মাসগুলোতেও ইবাদতের তওফীক ও সাহস লাভ করা যায়। অনুরূপ কেউ এ মাসগুলোতে পাপাচার থেকে নিজেকে দূরে রাখতে পারলে বছরের বাকী মাসগুলো-তেও পাপাচার থেকে দূরে থাকা সহজ হয়। তাই এ সুযোগের সদ্ব্যবহার থেকে বিরত থাকা হবে অপূরণীয় ক্ষতি।

এ পর্যন্ত ছিল জাহেলী প্রথার বর্ণনা ও তার নিন্দাবাদ। আয়াতের শেষ বাক্যে সূরা তওবার শুরুতে প্রদত্ত আদেশের পুনরাবৃত্তি করা হয় অর্থাৎ চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার পর সমস্ত কাফির ও মুশরিকের সাথে জিহাদ করাই ওয়াজিব।

দ্বিতীয় আয়াতেও সেই জাহেলী প্রথার উল্লেখ করা হয় নিম্নরূপেঃ اِنَّمَا النَّسِيْٓءُ زِيَادَةٌ فِى الْكُفْرِ নিষিদ্ধকাল অন্য মাসে পিছিয়ে দেওয়া কেবল কুফরীর মাত্রাকেই বৃদ্ধি করে। نسى অর্থ পিছিয়ে দেওয়া এবং পরে আনা।

মুশরিকদের ধারণা ছিল যে, মাসের এই ওলট-পালট করার ফলে একদিকে আমাদের উদ্দেশ্যও সফল হবে এবং অন্যদিকে আল্লাহ্‌র হুকুমেরও তা'মিল হবে। কিন্তু আল্লাহ্‌ বলেন যে, এর ফলে তাদের কুফরীর মাত্রা বৃদ্ধি পাবে, যাতে তাদের গোমরাহী উত্তরোত্তর বাড়তে থাকবে অর্থাৎ কোন বছরে নিষিদ্ধ মাসগুলোকে হারাম করে এবং আর কোন বছরে হালাল করে। لِّيُوَاطِـُٔوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ "যাতে শুমার পূর্ণ করে নেয় আল্লাহর নিষিদ্ধ মাসগুলো" বাক্যের মর্ম হল শুধু গণনা পূরণ দ্বারা হুকুমের তামিল হয় না ; বরং যে হুকুম যে মাসের সাথে নির্দিষ্ট, তা সে মাসেই করতে হবে।

আহকাম ও মাসায়েল

উপরোক্ত আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মাসের যে ধারাবাহিকতা এবং মাস-গুলোর যে নাম ইসলামী শরীয়তে প্রচলিত তা মানবরচিত পরিভাষা নয় বরং রব্বুল আলামীন যেদিন আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন, সেদিনই মাসের তরতীব, নাম ও বিশেষ মাসের সাথে সংশ্লিষ্ট হুকুম-আহ্‌কাম নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। আয়াত দ্বারা আরও প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে শরীয়তের আহ্‌কামের ক্ষেত্রে চান্দ্রমাসই নির্ভরযোগ্য। চান্দ্রমাসের হিসাব মতেই রোযা, হজ্ব ও যাকাত প্রভৃতি আদায় করতে হয়। তবে কোরআন মজীদ চন্দ্রকে যেমন, তেমনি সূর্যকেও সন-তারিখ ঠিক করার মানদণ্ডরূপে অভিহিত করেছে--- لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ (যাতে তোমরা বৎসর গণনা ও কাল নির্ণয়ের জ্ঞান লাভ কর)। অতএব চন্দ্র ও সূর্য এই দুয়ের মাধ্যমেই সন-তারিখ নির্দিষ্ট করা জায়েয। তবে চন্দ্রের হিসাব আল্লাহ্‌র অধিকতর পছন্দ। তাই শরীয়তের আহকামকে চন্দ্রের সাথে সংশ্লিষ্ট রেখেছেন। এজন্য চান্দ্র বছরের হিসাব সংরক্ষণ করা ফরযে-কিফায়া ; সকল উম্মত এ হিসাব ভুলে গেলে সবাই গুনাহ্‌গার হবে। চাঁদের হিসাব ঠিক রেখে অন্যান্য সূত্রের হিসাব ব্যবহার করা জায়েয আছে। তবে তা আল্লাহ্‌ ও পরবর্তীদের তরীকার বরখেলাফ। সুতরাং অনাবশ্যকভাবে অন্য হিসাব নিয়ে মাথা ঘামানো উচিত নয়।

মাসের হিসাব পূর্ণ করার উদ্দেশ্যে মূল মাস বাড়ানোর যে প্রথা আছে এই আয়া-তের প্রেক্ষিতে কেউ কেউ তাকেও নাজায়েয মনে করেন। কিন্তু এই মত ঠিক নয়। কেননা, এতে শরীয়তের বিধানের কোন সম্পর্ক নেই। জাহেলী যুগে চান্দ্রমাস পরিবর্তনের ফলে শরীয়তের হুকুম পরিবর্তিত হতো বিধায় তা থেকে নিষেধ করা হয়েছে। মুসলমানের দ্বারা যেহেতু কোন হুকুম পরিবর্তন হয় না, তাই তা উক্ত নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত নয়।

يَٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انفِرُوا فِي سَبِيلِ
اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ ۚ أَرَضِيتُم بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ

الْاٰخِرَةِ ۚ فَمَا مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا فِي الْاٰخِرَةِ اِلَّا قَلِيْلٌ ﴿٣٨﴾ اِلَّا
تَنْفِرُوْا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ۙ وَّ يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا
تَضُرُّوْهُ شَيْـًٔا ۗ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٣٩﴾ اِلَّا تَنْصُرُوْهُ فَقَدْ
نَصَرَهُ اللّٰهُ اِذْ اَخْرَجَهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ثَانِيَ اثْنَيْنِ اِذْ هُمَا فِي الْغَارِ
اِذْ يَقُوْلُ لِصَاحِبِهٖ لَا تَحْزَنْ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا ۚ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ
سَكِيْنَتَهٗ عَلَيْهِ وَاَيَّدَهٗ بِجُنُوْدٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ
الَّذِيْنَ كَفَرُوا السُّفْلٰى ۗ وَكَلِمَةُ اللّٰهِ هِيَ الْعُلْيَا ۗ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ
حَكِيْمٌ ﴿٤٠﴾ اِنْفِرُوْا خِفَافًا وَّثِقَالًا وَّجَاهِدُوْا بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ
فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۗ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٤١﴾ لَوْ كَانَ
عَرَضًا قَرِيْبًا وَّسَفَرًا قَاصِدًا لَّاتَّبَعُوْكَ وَلٰكِنْۢ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ
الشُّقَّةُ ۗ وَسَيَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ ۚ
يُهْلِكُوْنَ اَنْفُسَهُمْ ۚ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ﴿٤٢﴾ ع

(৩৮) হে ঈমানদারগণ, তোমাদের কি হল, যখন আল্লাহর পথে বের হবার জন্য তোমাদের বলা হয়, তখন মাটি জড়িয়ে ধর, তোমরা কি আখিরাতের পরিবর্তে দুনিয়ার জীবনে পরিতুষ্ট হয়ে গেলে? অথচ আখিরাতের তুলনায় দুনিয়ার জীবনের উপকরণ অতি অল্প। (৩৯) যদি বের না হও, তবে আল্লাহ্ তোমাদের মর্মন্তুদ আযাব দেবেন এবং অপর জাতিকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন। তোমরা তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না, আর আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে শক্তিমান। (৪০) যদি তোমরা তাকে (রাসূলকে) সাহায্য না কর, তবে মনে রেখো, আল্লাহ্ তার সাহায্য করেছিলেন, যখন তাকে কাফিররা বহিষ্কার করেছিল, তিনি ছিলেন দু'জনের একজন, যখন তারা গুহার মধ্যে ছিলেন। তখন তিনি আপন সঙ্গীকে বললেন, বিষণ্ণ হইও না, আল্লাহ্ আমাদের সাথে আছেন। অতপর আল্লাহ্ তার প্রতি স্বীয় সান্ত্বনা নাযিল করলেন এবং তার সাহায্যে এমন বাহিনী পাঠালেন, যা তোমরা দেখনি। বস্তুত আল্লাহ্ কাফিরদের মাথা নীচু করে দিলেন আর

আল্লাহ্‌র কথাই সদা সমুন্নত এবং আল্লাহ্‌ পরাক্রমশীল, প্রজ্ঞাময় (৪১) তোমরা বের হয়ে পড় স্বল্প বা প্রচুর সরঞ্জামের সাথে এবং জিহাদ কর আল্লাহ্‌র পথে নিজেদের মাল ও জান দিয়ে, এটি তোমাদের জন্য অতি উত্তম, যদি তোমরা বুঝতে পার। (৪২) যদি আশু লাভের সম্ভাবনা থাকতো এবং যাত্রাপথও সংক্ষিপ্ত হতো, তবে তারা অবশ্যই আপনার সহযাত্রী হতো, কিন্তু তাদের নিকট যাত্রাপথ সুদীর্ঘ মনে হল। আর তারা এখনই শপথ করে বলবে, আমাদের সাধ্য থাকলে অবশ্যই তোমাদের সাথে বের হতাম, এরা নিজেরাই নিজেদের বিনষ্ট করছে, আর আল্লাহ্‌ জানেন যে, এরা মিথ্যাবাদী।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

হে ঈমানদারগণ, তোমাদের কি হল, যখন আল্লাহ্‌র পথে (জিহাদে) বের হবার জন্য তোমাদের বলা হয়, তখন মাটি জড়িয়ে ধর, (প্রস্তুত হয়ে বের হইতে চাও না) তোমরা কি আখিরাতের পরিবর্তে দুনিয়ার জীবনে পরিতুষ্ট হয়ে গেলে? অথচ, আখিরাতের তুলনায় দুনিয়ার জীবনের উপকরণ অতি নগণ্য। যদি তোমরা এই (জিহাদের জন্য) বের না হও, তবে আল্লাহ্‌ তোমাদের কঠোর শাস্তি দেবেন (অর্থাৎ তোমাদের বিনাশ করে দেবেন) এবং তোমাদের স্থলে অন্য জাতির অভ্যুদয় ঘটাবেন (এবং তাদের দ্বারাই আল্লাহ্‌ কাজ নেবেন)। আর তোমরা তাঁর (দীনের কোন ক্ষতি সাধন করতে পারবে না। আল্লাহ্‌ সর্ব ব্যাপারে শক্তিমান। যদি তোমরা তাঁর [রসূলের সাহায্য না কর (তবে) তখনই আল্লাহ্‌ও তাঁকে সাহায্য করেছিলেন যখন (তাঁর এর থেকে আরও বেশি দুঃসহ অবস্থা ছিল।] কাফিররা তাঁকে (অতিষ্ঠ করে মক্কা থেকে) বহিষ্কার করেছিল, যখন তিনি ছিলেন দু'জনের একজন (দ্বিতীয়জন ছিলেন হযরত আবূ বকর সিদ্দিক (রা) তাঁর সফর সঙ্গী হিসাবে), যখন উভয়ে (সওর) গুহার মধ্যে ছিলেন, তখন তিনি আপন সঙ্গীকে বললেন (এতটুকুও) বিষণ্ণ হইও না, (নিশ্চয়) আল্লাহ্‌ (তা'আলার সাহায্য) আমাদের সাথে আছে। সে (সাহায্য হল) আল্লাহ্‌ তাঁর (অন্তরের) প্রতি স্বীয় (পক্ষ থেকে) সান্ত্বনা নাযিল করলেন এবং (ফেরেশতাদের) এমন বাহিনী দ্বারা তাঁকে শক্তি যোগালেন, যাদের তোমরা দেখনি। আর আল্লাহ্‌ কাফিরদের মাথা (ও কৌশল) নীচু করে দিলেন (যেন ব্যর্থ হয়) এবং আল্লাহ্‌র কথাই সমুন্নত থাকল (যে তাঁর তদবীর ও নিরাপত্তা ব্যবস্থাই সফল হল।) আর আল্লাহ্‌ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (তাই তাঁর বাণী ও প্রজ্ঞা জয়ী হল)। তোমরা (জিহাদের জন্য) বের হয়ে পড়, সরঞ্জাম স্বল্প হোক বা প্রচুর এবং আল্লাহর পথে জিহাদ কর জান ও মাল দিয়ে। এটি তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা একীন রাখ (তবে বিলম্ব করো না।) যদি আশু লাভের সম্ভাবনা থাকত এবং যাত্রাপথ সংক্ষিপ্ত হত, তবে তারা অবশ্যই আপনার সহযাত্রী হত, কিন্তু যাত্রাপথ তাদের কাছে সুদীর্ঘ মনে হল (তাই ঘরে বসে থাকল)। আর যখন (তোমরা প্রত্যাবর্তন করবে,) তারা শপথ করে বলবে, আমাদের সাধ্য হলে অবশ্যই তোমাদের সাথে যেতাম। এরা (উপর্যুপরি মিথ্যা বলে) নিজেদের

বিনষ্ট (আযাবের উপযুক্ত) করেছে। আল্লাহ জানেন যে, এরা মিথ্যাবাদী (সাধ্য থাকা সত্ত্বেও জিহাদ থেকে বিরত রয়েছে)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

উপরোক্ত আয়াতসমূহে রসূলে করীম (সা) কর্তৃক পরিচালিত এক গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধের বর্ণনা এবং প্রসঙ্গে অনেকগুলো হুকুম ও পথনির্দেশ উল্লেখ করা হয়েছে। তা হল তাবুক যুদ্ধ, মহানবী (সা)-এর প্রায় সর্বশেষ যুদ্ধ।

'তাবুক' মদীনার উত্তর দিকে অবস্থিত সিরিয়া সীমান্তের নিকটবর্তী একটি জায়গার নাম। সিরিয়া ছিল তৎকালে রোমান সাম্রাজের একটি প্রদেশ! রসূলে করীম (সা) অষ্টম হিজরীতে মক্কা বিজয় ও হোনাইন যুদ্ধ সমাপন করে যখন মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন, তখন আরব ব'দ্বীপের গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলো ইসলামী রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল এবং মক্কার মুশরিকদের সাথে একটানা আট বছর যুদ্ধ চালিয়ে মুসলমানরা একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস নেওয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন।

কিন্তু যে রব্বুল আলামীন ইতিপূর্বে সকল দীনের উপর ইসলামের বিজয় সম্বলিত আয়াত ليظهره على الدين كله নাযিল করে সারা বিশ্বে ইসলামের বিজয় কেতন উড়ানোর সংবাদ দিয়েছেন, তাঁর পক্ষে অবসর যাপনের সময় কোথায়? মহানবী (সা) মদীনা পৌঁছা মাত্র সিরিয়া প্রত্যাগত যয়তুন তৈল ব্যবসায়ী দলের মুখে সংবাদ পেলেন যে, রোমান সম্রাট হিরাক্লিয়াস সিরিয়ার সীমান্তবর্তী তাবুকে তার সেনাবাহিনী সমাবেশ করছে এবং এক বছরের অগ্রিম বেতন দিয়ে তাদের পরিতুষ্ট রেখেছে। আরও সংবাদ পাওয়া গেল যে, আরবের কতিপয় গোত্রের সাথেও তাদের যোগসাজশ রয়েছে। তাদের পরিকল্পনা হ'ল, মদীনায় অতর্কিত আক্রমণ চালিয়ে সবকিছু তছনছ করে দেবে।

এ সংবাদ পেয়ে রসূলে করীম (সা) তাদের আক্রমণের আগে ঠিক তাদের অবস্থান ক্ষেত্রে অভিযান পরিচালনার সংকল্প নিলেন।---(তফসীরে মাযহারী, মুহাম্মদ বিন ইউসুফ-এর সৌজন্যে)

ঘটনাচক্রে তখন ছিল গ্রীষ্মকাল। মদীনার অধিবাসীরা সাধারণ কৃষিজীবী। তখন তাদের ফসল কাটার সময়---যা ছিল তাদের গোটা বছরের জীবিকা। বলা বাহুল্য, চাকুরীজীবীদের অর্থকড়ি যেমন মাস শেষে ফুরিয়ে আসে, তেমনি নতুন মৌসুমের আগে কৃষিজীবীদের গোলাও খালি হয়ে যায়! তাই একদিকে অভাব-অনটন; অন্যদিকে ঘরে ফসল তোলার আশা, তদুপরি গ্রীষ্মের প্রচণ্ড খরা-দীর্ঘ আট বছরের রণক্লান্ত মুসলমানদের জন্য ছিল এক বিরাট পরীক্ষার বিষয়।

কিন্তু সময়ের দাবি উপেক্ষা করা যায় না। বিশেষত এ যুদ্ধ হল সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধরনের। আগেকার যুদ্ধগুলো সংঘটিত হয়েছিল নিজেদের সাধারণ মানুষের সাথে, কিন্তু বর্তমান যুদ্ধটি হবে রোমান সম্রাটের সুশিক্ষিত সেনাবাহিনীর সাথে। তাই রসূলুল্লাহ্ (সা) মদীনার সকল মুসলমানকে যুদ্ধে বের হবার আদেশ দেন এবং আশপাশের অন্যান্য গোত্রগুলোকেও এতে অংশ নেওয়ার আহবান জানান।

যুদ্ধে অংশগ্রহণের এ সাধারণ আহবান ছিল মুসলমানদের জন্য অগ্নি-পরীক্ষা এবং ইসলামের মৌখিক দাবীদার মুনাফিকদের সনাক্ত করার মোক্ষম উপায়। তাই এদের কথা বাদ দিলেও খোদ মুসলমানরাও অবস্থা বিশেষে বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল।

একদল হল যারা কোনরূপ দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছাড়াই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়। অপর দল কিছু দ্বিধা-সঙ্কোচের মধ্যে প্রথম দলের সাথে শামিল হয়। এ দু'দল সম্পর্কে কোরআন বলে ঃ

الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِن بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ

فَرِيقٍ مِّنْهُمْ অর্থাৎ "তা প্রশংসার যোগ্য, যারা তীব্র সঙ্কটকালে তাঁর আনুগত্য করেছে তাদের একদলের অন্তরসমূহ বিচ্যুতির কাছাকাছি হওয়ার পরেও।"

তৃতীয় দল যারা প্রকৃত কোন ওযরের ফলে যুদ্ধে শরীক হতে পারেনি। কোর-আন তাদের সম্পর্কে বলে ঃ لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى— অর্থাৎ দুর্বল ও পীড়িত লোকদের জন্য গুনাহ্‌র কিছু নেই। একথা বলে তাদের ওযর কবুল হওয়ার কথা প্রকাশ করা হয়।

চতুর্থ দল হল, যারা কোন ওযর-অসুবিধা ছাড়াই নিছক অলসতার দরুন যুদ্ধযাত্রা থেকে বিরত থাকে। এদের ব্যাপারে কয়েকটি আয়াত নাযিল হয়েছে। যেমন— وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ 'যারা নিজেদের অপরাধ স্বীকার করেছে—

آخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا

আয়াতগুলোতে উক্ত দলের অলসতার দরুন শাস্তির হুমকি এবং পরিশেষে তাদের তওবা কবুল হওয়ার সুসংবাদ রয়েছে।

পঞ্চম দল হল মুনাফিকদের। এরা পরীক্ষার এই কঠিন মুহূর্তে নিজেদের আর লুকিয়ে রাখতে পারেনি। এরা যুদ্ধ থেকে দূরে সরে থাকে। কোরআনের অনেকগুলো আয়াতে এদের বর্ণনা রয়েছে।

ষষ্ঠ দল হল মুনাফিকদের সেই উপদল, যারা গোয়েন্দা বৃত্তি ও বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে মুসলমানদের কাতারে শামিল হয়ে যায়। وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ (আয়াত ৪৭) وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ (আয়াত ৬৫) এবং وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا (৭৪) আয়াতসমূহে এ মুনাফিকদের বর্ণনা দেওয়া হয়।

কিন্তু এ সকল প্রতিকূলতা সত্ত্বেও যুদ্ধে অনিচ্ছুক ব্যক্তিদের সংখ্যা ছিল নিতান্ত নগণ্য। বিপুল সেই মুসলমানদের সংখ্যায় ছিল, যারা সর্বস্ব বিসর্জন দিয়ে আল্লাহ্‌র রাহে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত। তাই এ যুদ্ধে ইসলামী সৈন্যের সংখ্যা ছিল ত্রিশ হাজার, যা ইতিপূর্বেকার কোন যুদ্ধে দেখা যায়নি।

এত বিপুল সংখ্যক মুসলমানের যুদ্ধযাত্রার সংবাদ রোম সম্রাটের কানে গেলে সে ভীষণভাবে সন্ত্রস্ত হয় এবং যুদ্ধ থেকে বিরত থাকে। রসূলে করীম (সা) সাহাবীদের নিয়ে কয়েক দিন রণক্ষেত্রে অবস্থান করার পর তাদের মুকাবিলার ব্যাপারে নিরাশ হয়ে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করলেন।

উল্লিখিত আয়াতগুলোর সম্পর্ক বাহ্যত সেই চতুর্থ দলের সাথে, যারা ওযর-আপত্তি ছাড়া শুধু অলসতার দরুন যুদ্ধযাত্রা থেকে বিরত ছিল। প্রথম আয়াতে অলসতার জন্য সাজার হুমকি, তৎসঙ্গে অলসতার মূল কারণ এবং পরে তার প্রতিকারের উপায় কি, তা' বর্ণিত হয়। এ বর্ণনা থেকে যে বিষয়টি বিশেষভাবে পরিষ্কার হয়েছে তা হল ঃ

দুনিয়ার মোহ ও আখিরাতের প্রতি উদাসীনতা সকল অপরাধের মূল ঃ অলসতার যে কারণ ও প্রতিকারের উপায় এখানে বর্ণিত হয়েছে, তা' এক বিশেষ ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট হলেও চিন্তা করলে বোঝা যাবে যে, দীনের ব্যাপারে সকল আলস্য ও নিষ্ক্রিয়তা ও সকল অপরাধ এবং গুনাহ্‌র মূলে রয়েছে দুনিয়ার প্রীতি ও আখিরাতের প্রতি উদাসীনতা। হাদীস শরীফে আছে ঃ حب الدنيا رأس كل خطيئة অর্থাৎ দুনিয়ার মোহ সকল গুনাহের মূল। সেজন্য আয়াতে বলা হয় ঃ

"হে ঈমানদারগণ, তোমাদের কি হল, আল্লাহ্‌র পথে বের হওয়ার জন্য বলা হলে তোমরা মাটি জড়িয়ে ধর (চলাফেরা করতে চাও না)। আখিরাতের পরিবর্তে দুনিয়ার জীবন নিয়েই কি পরিতুষ্ট হয়ে গেলে।"

রোগ নির্ণয়ের পর পরবর্তী আয়াতে তার প্রতিকার এই বলে উল্লেখ করা হয় ঃ "দুনিয়াবী জিন্দেগীর ভোগের উপকরণ আখিরাতের তুলনায় অতি নগণ্য।"

যার সারকথা হল, আখিরাতের স্থায়ী জীবনের চিন্তা-ভাবনাই মানুষের করা উচিত। বস্তুত আখিরাতের চিন্তা-ফিকিরই সকল রোগের একমাত্র প্রতিকার এবং অপরাধ দমনের সার্থক উপায়।

ইসলামী আকীদার মৌলিক বিষয় তিনটি ঃ তাওহীদ, রিসালত ও পরকালে বিশ্বাস। তন্মধ্যে পরকালের বিশ্বাস হল বিশুদ্ধ আমলের রূহ এবং গোনাহ ও অপরাধের ক্ষেত্রে এক দুর্ভেদ্য প্রাচীর। চিন্তা করলে পরিষ্কার হবে যে, দুনিয়ার শান্তি-শৃংখলা আখিরাতের আকীদা ব্যতীত প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। বস্তুবাদী উন্নতির এখন যৌবন কাল। অপরাধ দমনে সকল জাতি ও দেশের চেষ্টা-তদবীরের অন্ত নেই। আইন-আদালত ও অপরাধ দমনকারী সংস্থাসমূহের উন্নত ব্যবস্থাপনা সবই আছে। কিন্তু তা' সত্ত্বেও আমরা প্রত্যক্ষ করছি যে, প্রত্যেক দেশ ও জাতির মধ্যে অপরাধপ্রবণতা দৈনিন্দিন বেড়েই চলছে। আমাদের দৃষ্টিতে সঠিক রোগ নির্ণয় ও তার সঠিক প্রতিকারের

ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না বলেই আজকের এ অস্থিরতা। বস্তুত এ সকল রোগের মূলে রয়েছে বস্তুবাদী ধ্যান-ধারণা, দুনিয়াবী ব্যস্ততা এবং আখিরাতের প্রতি উদাসীনতা। আমাদের বিশ্বাস, এর একমাত্র প্রতিকার হল, আল্লাহ্‌র যিকির ও স্মরণ এবং আখিরাতের চিন্তা-ভাবনা। যে দেশে যখন এই অমোঘ প্রতিকার প্রয়োগ করা হয়, সে দেশ ও সমাজ মানবতার মূর্ত প্রতীক হয়ে ফেরেশতাদেরও ঈর্ষার পাত্র হয়। নবী ও সাহাবা কিরামের স্বর্ণ-যুগ তার জলন্ত প্রমাণ।

আজকের বিশ্ব অপরাধপ্রবণতার উচ্ছেদ চায়, কিন্তু আল্লাহ্ ও আখিরাত থেকে উদাসীন হয়ে পদে পদে এমন ব্যবস্থাও করে রাখছে, যার ফলে আল্লাহ্ ও আখিরাতের প্রতি মনোযোগ আসে না। তাই এর অবশ্যম্ভাবী পরিণতি আমরা প্রত্যক্ষ করছি যে, অপরাধ দমনের সকল উন্নত ব্যবস্থাপনাই ব্যর্থ হয়ে পড়ছে। অপরাধ দমন তো দূরের কথা, ঝড়ের বেগে যেন তা' বৃদ্ধি পাচ্ছে। হায়! আজকের চিন্তাশীল মহল যদি উপরোক্ত কোরআনী প্রতিকার প্রয়োগ করে দেখত, তবে বুঝতে পারত, কত সহজে অপরাধপ্রবণতার উচ্ছেদ সাধন করা যায়।

দ্বিতীয় আয়াতে অলস ও নিষ্ক্রিয় লোকদের ব্যাধি ও তার প্রতিকারের উল্লেখ করে সর্বশেষ ফয়সালা জানিয়ে দেওয়া হয় যে, "তোমরা জিহাদে বের না হলে আল্লাহ্ তোমাদের মর্মন্তুদ শাস্তি দেবেন এবং তোমাদের স্থলে অন্য জাতির উত্থান ঘটাবেন। আর দীনের আমল থেকে বিরত হয়ে তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের বিন্দুমাত্র ক্ষতি করতে পারবে না। কেননা আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে শক্তিমান।

তৃতীয় আয়াতে রসূলে করীম (সা)-এর হিজরতের ঘটনা উল্লেখ করে দেখিয়ে দেয়া হয় যে, আল্লাহ্‌র রসূল কোন মানুষের সাহায্য-সহযোগিতার মোহতাজ নন। আল্লাহ্ প্রত্যক্ষভাবে গায়েব থেকে তাঁর সাহায্য করতে সক্ষম। যেমন, হিজরতের সময় করা হয়, যখন তাঁর আপন গোত্র ও দেশবাসী তাঁকে দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য করে। সফর-সঙ্গী হিসাবে একমাত্র সিদ্দীকে আকবর (রা) ছাড়া আর কেউ ছিল না। পদব্রজী ও অশ্বারোহী শত্রুরা সর্বত্র তাঁর খোঁজ করে ফিরছে। অথচ আশ্রয়স্থল কোন মজবুত দুর্গ ছিল না; বরং তা ছিল এক গিরিগুহা, যার দ্বারপ্রান্ত পর্যন্ত পৌঁছেছিল তাঁর শত্রুরা। তখন গুহা সঙ্গী হযরত আবূ বকর (রা)-এর চিন্তা নিজের জন্য ছল না, বরং তিনি এই ভেবে সন্ত্রস্ত হয়েছিলেন যে, হয়ত শত্রুরা তাঁর বন্ধুর জীবন নাশ করে দেবে কিন্তু এ সময়েও রসূলুল্লাহ্ ছিলেন পাহাড়ের মত অনড়, অটল ও নিশ্চিন্ত। শুধু যে নিজে, তা নয়, বরং সফর সঙ্গীকেও অভয় দিয়ে বলছিলেন, চিন্তিত হইও না, আল্লাহ্ আমাদের সাথে আছেন।" দু'শব্দের এ বাক্যটি বলা মুশকিল কিছু নয়। কিন্তু শ্রোতৃবৃন্দ এ নাযক দৃশ্য সামনে রেখে চিন্তা করলে বুঝতে দেরী হবে না যে, নিছক দুনিয়াবী উপায় উপকরণের প্রতি ভরসা রেখে মনের এই নিশ্চিন্ত ভাব সম্ভব নয়। তবুও যে সম্ভব হল আয়াতের পরবর্তী বাক্যে তার রহস্য বলে দেওয়া হল। ইরশাদ হয়ঃ "আল্লাহ্ তাঁর কলব মুবারকে সান্ত্বনা নাযিল করেন এবং এমন বাহিনী দ্বারা তাঁর সাহায্য করেন, যা তোমাদের দৃষ্টিগোচর হয়নি।" অদৃশ্য বাহিনী বলতে ফেরেশতারাও হতে পারেন

এবং জগতের গোপন শক্তিসমূহও হতে পারে। কারণ, এগুলোও আল্লাহ্‌র সৈন্যদল। সারকথা, এর ফলে কুফরীর পতাকা অবনমিত হয় এবং আল্লাহ্‌র ঝাণ্ডা মাথা তুলে দাঁড়ায়।

চতুর্থ আয়াতে তাগিদদানের উদ্দেশ্যে পুনরুল্লেখ করা হয়েছে যে, জিহাদে বের হবার জন্য রসূলুল্লাহ্ (সা) যখন তোমাদের আদেশ করেন, তখন সর্বাবস্থায় তা তোমাদের জন্য ফরয হয়ে গেল। আর এ আদেশ পালনের মাঝেই নিহিত রয়েছে তোমাদের সমুদয় কল্যাণ।

পঞ্চম আয়াতে অলসতার দরুন জিহাদ থেকে বিরত রয়েছে এমন লোকদের একটি ওযরকে প্রত্যাখ্যান করে বলা হয় যে, এ ওযর গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ আল্লাহ্ যে শক্তি-সামর্থ্য তাদের দান করেছেন, তা আল্লাহ্‌র রাহে সাধ্যমত ব্যয় করেনি। তাই তাদের অসমর্থ থাকার ওযর গ্রহণযোগ্য নয়।

عَفَا اللّٰهُ عَنْكَ ۚ لِمَ اَذِنْتَ لَهُمْ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِيْنَ
صَدَقُوْا وَتَعْلَمَ الْكٰذِبِيْنَ ﴿٤٣﴾ لَا يَسْتَاْذِنُكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ
بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ اَنْ يُّجَاهِدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ ؕ وَاللّٰهُ
عَلِيْمٌۢ بِالْمُتَّقِيْنَ ﴿٤٤﴾ اِنَّمَا يَسْتَاْذِنُكَ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ
وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوْبُهُمْ فَهُمْ فِيْ رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُوْنَ ﴿٤٥﴾
وَلَوْ اَرَادُوا الْخُرُوْجَ لَاَعَدُّوْا لَهٗ عُدَّةً وَّلٰكِنْ كَرِهَ اللّٰهُ
انْۢبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيْلَ اقْعُدُوْا مَعَ الْقٰعِدِيْنَ ﴿٤٦﴾ لَوْ خَرَجُوْا
فِيْكُمْ مَّا زَادُوْكُمْ اِلَّا خَبَالًا وَّلَاَاوْضَعُوْا خِلٰلَكُمْ يَبْغُوْنَكُمُ
الْفِتْنَةَ ۚ وَفِيْكُمْ سَمّٰعُوْنَ لَهُمْ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِالظّٰلِمِيْنَ ﴿٤٧﴾ لَقَدِ
ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوْا لَكَ الْاُمُوْرَ حَتّٰى جَآءَ الْحَقُّ
وَظَهَرَ اَمْرُ اللّٰهِ وَهُمْ كٰرِهُوْنَ ﴿٤٨﴾ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّقُوْلُ ائْذَنْ لِّيْ
وَلَا تَفْتِنِّيْ ؕ اَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوْا ؕ وَاِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيْطَةٌۢ
بِالْكٰفِرِيْنَ ﴿٤٩﴾ اِنْ تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ ۚ وَاِنْ تُصِبْكَ مُصِيْبَةٌ

يَّقُوْلُوْا قَدْ اَخَذْنَآ اَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ وَ يَتَوَلَّوْا وَّهُمْ فَرِحُوْنَ ۝٥٠

قُلْ لَّنْ يُّصِيْبَنَآ اِلَّا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَنَا ۚ هُوَ مَوْلٰىنَا ۚ وَعَلَى اللّٰهِ

فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ۝٥١ قُلْ هَلْ تَرَبَّصُوْنَ بِنَآ اِلَّآ اِحْدَى

الْحُسْنَيَيْنِ ۖ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ اَنْ يُّصِيْبَكُمُ اللّٰهُ بِعَذَابٍ مِّنْ

عِنْدِهٖٓ اَوْ بِاَيْدِيْنَا ۖ فَتَرَبَّصُوْٓا اِنَّا مَعَكُمْ مُّتَرَبِّصُوْنَ ۝٥٢

(৪৩) আল্লাহ্ আপনাকে ক্ষমা করুন, আপনি কেন তাদের অব্যাহতি দিলেন, যে পর্যন্ত না আপনার কাছে পরিষ্কার হয়ে যেত কারা সত্যবাদী এবং জেনে নিতেন মিথ্যা-বাদীদের। (৪৪) আল্লাহ্ ও রোজ কিয়ামতের প্রতি যাদের ঈমান রয়েছে, তারা মাল ও জান দ্বারা জিহাদ করা থেকে আপনার কাছে অব্যাহতি কামনা করবে না, আর আল্লাহ্ সাবধানীদের ভাল জানেন। (৪৫) নিঃসন্দেহ তারাই আপনার কাছে অব্যাহতি চায়, যারা আল্লাহ্ ও রোজ কিয়ামতে ঈমান রাখে না এবং তাদের অন্তর সন্দেহগ্রস্ত হয়ে পড়েছে, সুতরাং সন্দেহের আবর্তে তারা ঘুরপাক খেয়ে চলছে। (৪৬) আর যদি তারা বের হবার সংকল্প নিত, তবে অবশ্যই কিছু সরঞ্জাম প্রস্তুত করতো। কিন্তু তাদের উত্থান আল্লাহ্র পছন্দ নয়, তাই তাদের নিবৃত্ত রাখলেন এবং আদেশ হল উপবিষ্ট লোকদের সাথে তোমরা বসে থাক। (৪৭) যদি তোমাদের সাথে তারা বের হত, তবে তোমাদের অনিষ্ট ছাড়া আর কিছু বৃদ্ধি করতো না, আর অশ্ব ছুটাত তোমাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে। আর তোমাদের মাঝে রয়েছে তাদের গুপ্তচর। বস্তুত আল্লাহ্ জালিমদের ভালভাবেই জানেন। (৪৮) তারা পূর্ব থেকেই বিভেদ সৃষ্টির সুযোগ সন্ধানে ছিল এবং আপনার কার্যসমূহ ওলট পালট করে দিচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত সত্য প্রতিশ্রুতি এসে গেল এবং জয়ী হল আল্লাহ্র হুকুম, যে অবস্থায় তারা মন্দ বোধ করল। (৪৯) আর তাদের কেউ বলে, আমাকে অব্যাহতি দিন এবং পথভ্রষ্ট করবেন না। শুনে রাখ, তারা তো পূর্ব থেকেই পথভ্রষ্ট এবং নিঃসন্দেহে জাহান্নাম এই কাফিরদের পরিবেষ্টন করে রয়েছে। (৫০) আপনার কোন কল্যাণ হলে তারা মন্দবোধ করে এবং কোন বিপদ উপস্থিত হলে তারা বলে, আমরা পূর্ব থেকেই নিজেদের কাজ সামলে নিয়েছি এবং ফিরে যায় উল্লসিত মনে। (৫১) আপনি বলুন, আমাদের কাছে কিছুই পৌঁছবে না, কিন্তু যা আল্লাহ্ আমাদের জন্য রেখেছেন। তিনি আমাদের কার্য নির্বাহক। আল্লাহর উপরই মু'মিনদের ভরসা করা উচিত। (৫২) আপনি বলুন, তোমরা তো আমাদের জন্য দু'কল্যাণের একটি প্রত্যাশা কর; আর আমরা প্রত্যাশায় আছি তোমাদের জন্য যে, আল্লাহ্ তোমাদের আযাব দান করুক নিজের পক্ষ থেকে অথবা আমাদের হস্তে। সুতরাং তোমরা অপেক্ষা কর, আমরাও তোমাদের সাথে অপেক্ষমান।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা (তো) করে দিলেন, (কিন্তু) আপনি তাদের (এত শীঘ্র) কেন অব্যাহতি দিলেন, যে পর্যন্ত না স্পষ্ট হয়ে যেত আপনার সামনে সত্যবাদীরা এবং (যে পর্যন্ত না) জেনে নিতেন মিথ্যাবাদীদের (এতে তারা আপনাকে প্রতারিত করে উল্লসিত হতে পারত না)। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ ও রোজ কিয়ামতের প্রতি যাদের ঈমান রয়েছে, তারা নিজেদের মাল ও জান দ্বারা জিহাদ করা থেকে (এবং তাতে শরীক না হওয়ার জন্য) আপনার কাছে অব্যাহতি কামনা করবে না (বরং আদেশ পাওয়ার সাথে সাথে দ্রুত এগিয়ে যাবে) আর আল্লাহ্ (সেই) মুত্তাকীদের ভাল করে জানেন (তাদের উপযুক্ত প্রতিদান ও সওয়াব দেবেন)। তবে তারাই (জিহাদে যাওয়া থেকে) আপনার কাছে অব্যাহতি চায়, যারা আল্লাহ্ ও রোজ কিয়ামতের প্রতি ঈমান রাখে না এবং (ইসলামের ব্যাপারে) তাদের অন্তর সন্দেহে পতিত, সুতরাং তারা নিজেদের সন্দেহের আবর্তে ঘুরপাক খেয়ে চলছে---(কখনো সহযোগিতার খেয়াল, কখনো বিরোধিতার মনোভাব)। আর যদি তারা (যুদ্ধে) বের হবার সংকল্প নিত (যেমন ওযর পেশ করাকালে বলেছিল, যাওয়ার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু অসুবিধা হেতু পারছি না। একথা সত্যি হলে) তবে (চলার) কিছু সরঞ্জাম সংগ্রহ করত (যেমন, সফরকালে সংগ্রহ করা হয়.) কিন্তু (আদতেই তাদের ইচ্ছা ছিল না। ফলে বিলম্ব হয়ে গেল। যেমন لَوْ خَرَجُوا فِيكُم আয়াতে তার বর্ণনা আসছে। আর এই বিলম্ব হেতু) আল্লাহ তাদের যাওয়া পছন্দ করেন না, (তাই তাদের তওফীক দিলেন না এবং সৃষ্টিগত রীতি মতে) তাদের বলা হল, বিকলাঙ্গ লোকদের সাথে তোমরাও বসে থাক। (আর তাদের যাওয়া শুভ না হওয়ার কারণ হল যে,) তারা তোমাদের সাথে শামিল থাকলে অধিক হারে ফাসাদ করা ছাড়া আর কিছুই করত না। (সেই ফাসাদ হল) তোমাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির সুযোগ খুঁজে বেড়াত (অর্থাৎ লাগানো-বাজানোর দ্বারা বিভেদ সৃষ্টি করত, মিথ্যা গুজব ছড়িয়ে অস্থির করে তুলত এবং শত্রুর ভয় দেখিয়ে তোমাদের হীনবল করত। তাই তাদের না যাওয়াটা ভালই হল) এবং (এখনো) তোমাদের মাঝে রয়েছে তাদের গুপ্তচর। আর আল্লাহ্ এই জালিমদের ভাল করেই জেনে নেবেন। (তাদের এই দুষ্টুমি নতুন কিছু নয়---) তারা ইতিপূর্বেও (ওহুদ যুদ্ধ প্রভৃতিতে) ফাসাদ সৃষ্টির চেষ্টা করেছিল (অর্থাৎ প্রথমে যুদ্ধে শরীক হয়ে পরে মুসলমানদের হীনবল করার জন্য সরে যায়) এবং (এছাড়া, আপনার ক্ষতি সাধনের উদ্দেশ্যে) আপনার কাজগুলোকে ওলট-পালট করার প্রয়াস পায়। এমতাবস্থায় (আল্লাহ্র) সত্য প্রতিশ্রুতি এমন অবস্থায় এসে যায় যখন তারা মন্দবোধ করছিল। (তা'হল) আল্লাহ্র হুকুম বিজয়ী থাকল। (অনুরূপ ভবিষ্যতেও কোন চিন্তা নেই) আর তাদের (মুনাফিকদের) কেউ কেউ আপনাকে বলে, আমাকে (যুদ্ধে না গিয়ে ঘরে থাকার) অনুমতি দিন এবং ক্ষতিগ্রস্ত করবেন না। ভাল করে শুনে নাও, তারা তো ক্ষতির মধ্যে পূর্ব থেকেই পতিত [কারণ, হযরত (সা)-এর অবাধ্যতা ও কুফরীর চেয়ে বড় ক্ষতি আর কি

হতে পারে?] আর নিঃসন্দেহে (পরকালে) জাহান্নাম এই কাফিরদের ঘিরে রাখবে। আপনার কোন কল্যাণ হলে তারা মন্দ বোধ করে এবং আপনার কোন বিপদ উপস্থিত হলে তারা (আনন্দের সাথে) বলে, আমরা (এজন্যই) পূর্ব থেকে নিজেদের জন্য সাবধানতার পথ অবলম্বন করেছিলাম। (অর্থাৎ যুদ্ধে শরীক হই নি।) আর (একথা বলে) উল্লসিত মনে ফিরে যায়। (হে রসূল,) আপনি (তাদের দু'টি কথা) বলুন, (প্রথমত) আমাদের কাছে কোন বিপদ আসবে না কিন্তু যা আল্লাহ্ আমাদের ভাগ্যে লিখে রেখেছেন তিনিই আমাদের প্রভু (সুতরাং প্রভু যা সাব্যস্ত করে, খাদিমের পক্ষে তার উপরই সন্তুষ্ট থাকা জরুরী।) আর (আমাদেরই বা বৈশিষ্ট্য কি) সমস্ত মুসলমানের যাবতীয় বিষয় আল্লাহ্র জন্য সোপর্দ করা উচিত। (দ্বিতীয়ত) বলুন (যে, আমাদের জন্য উত্তম অবস্থা যেমন উত্তম, সুপরিণতির প্রেক্ষিতে বালা-মুসীবতও উত্তম। কেননা এর দ্বারা পাপ মোচন হয় এবং মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। সুতরাং) তোমরা তো আমাদের জন্য দু'টি কল্যাণের একটির প্রত্যাশায় রয়েছ; (অর্থাৎ তোমরা তো অপেক্ষায় রয়েছ যে, দেখা যাক কি হয়। তা ভাল হোক বা মন্দ, উভয়ই আমাদের জন্য কল্যাণকর)। আর আমরা প্রত্যাশায় আছি আল্লাহ্ তোমাদের কোন্ আযাবে পতিত করবেন (তা) নিজের পক্ষ থেকে (হোক, দুনিয়া বা আখিরাতের) কিংবা আমাদের দ্বারা (তোমরা নিজেদের কুফরী প্রকাশ করলে অন্য কাফিরদের মত তোমাদেরও হত্যা করা হবে।) অতএব তোমরা অপেক্ষা কর (স্ব-অবস্থায়), আমরাও তোমাদের সাথে (স্ব-অবস্থায়) অপেক্ষা করব।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

এ রুকূর সতেরটি আয়াতের অধিকাংশ স্থান জুড়ে সেই মুনাফিকদের আলোচনা রয়েছে, যারা মিথ্যা বাহানা দাঁড় করে তাবুক যুদ্ধে অংশ না নেয়ার জন্য রসূলে করীম (সা)-এর অনুমতি নিয়েছিল। এ প্রসঙ্গে অনেকগুলো মাসায়েল, আহকাম ও হিদায়তের সমাবেশ রয়েছে।

প্রথম আয়াতে এক অপূর্ব সূক্ষ্ম ভঙ্গিতে হযরতের প্রতি অভিযোগ করা হয় যে, মুনাফিকরা মিথ্যা ওযর দেখিয়ে নিজেদের মা'যুর প্রকাশ করেছিল বটে, কিন্তু তাদের সত্য-মিথ্যা যাচাইয়ের আগে যুদ্ধ থেকে অব্যাহতি দেয়া হল কেন? যাতে এরা উল্লাস প্রকাশ করে বলছে যে, আল্লাহ্র রসূলকে সহজে প্রতারিত করতে সক্ষম হয়েছে। যদিও পরবর্তী আয়াতে স্পষ্ট করে দেন যে, নিছক বাহানা তালাশের জন্যই তাদের ওযর প্রকাশ, নতুবা অব্যাহতি না পেলেও তারা যুদ্ধে শরীক হত না। আলোচ্য আয়াতে একথাও পরিষ্কার করে দেওয়া হয় যে, তারা যুদ্ধে শরীক হলেও মুসলমানদের ক্ষতি ছাড়া লাভ কিছুই হত না। তবে একথার উদ্দেশ্য হল, যুদ্ধ থেকে তাদের অব্যাহতি না দিলেও তারা অবশ্য যেত না, কিন্তু এতে তাদের মনের কুটিলতা প্রকাশ হয়ে পড়ত এবং মুসলমানদের প্রতারিত করে উল্লাস প্রকাশের সুযোগ পেত না। আয়াতের শুরুতে

অভিযোগের যে ভাব, তার উদ্দেশ্য তিরস্কার করা নয়; বরং ভবিষ্যতের জন্য সতর্কীকরণ। বাহ্যত এক প্রকারের তিরস্কার মনে হলেও কত স্নেহমমত্বের সাথে তার প্রকাশ ঘটে। কি সুন্দর বাচনভঙ্গি ? لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ "কেন আপনি অনুমতি প্রদান করলেন" এর আগেই বলে দেওয়া হয় عَفَا اللّٰهُ عَنْكَ "আল্লাহ্ আপনাকে ক্ষমা করুন।" অর্থাৎ তিনি ক্ষমা করে দিয়েছেন।

রসূলে করীম (সা)-এর সুউচ্চ মর্যাদা ও শান এবং আল্লাহ্র পথে তাঁর গভীর সম্পর্কের প্রতি যাদের দৃষ্টি, তারা বলেন যে, আল্লাহ্র সাথে তাঁর সুগভীর সম্পর্কের প্রেক্ষিতে কোন কাজের জবাব তলব ছিল তাঁর বরদাশতের বাইরে। প্রথমেই যদি "কেন অব্যাহতি দিলেন" বলা হত, তবে রসূল (সা)-এর কলব মোবারকের পক্ষে তা সহ্য করা দুষ্কর হত। তাই প্রথমেই "আল্লাহ্ আপনাকে ক্ষমা করুন" বলে একদিকে ইঙ্গিত দেয়া হল যে, এমন কিছু হয়ে গেল যা আল্লাহ্র অপছন্দ। অন্যদিকে ক্ষমা করার আশ্বাসবাণী শোনানো হয়, যাতে তাঁর কলব মোবারক ভারাক্রান্ত হয়ে না পড়ে।

প্রশ্ন আসতে পারে, রসূলে করীম (সা) ছিলেন নিষ্পাপ। অতএব এখানে 'ক্ষমা' শব্দের ব্যবহার কেন? ক্ষমা তো গুনাহ্ ও অপরাধের জন্য হয়ে থাকে। এর উত্তর হল, 'ক্ষমা' শব্দটির প্রয়োগ যেমন গুনাহের জন্য, তেমনি অপছন্দ ও উত্তম নয় এমন ব্যাপারেও করা যেতে পারে। আর এটি নিষ্পাপ হওয়ার পরিপন্থী নয়।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় আয়াতে মু'মিন ও মুনাফিকের পার্থক্য দেখানো হয়েছে যে, মু'মিনগণ জান ও মালের মোহে পড়ে জিহাদ থেকে বাঁচার জন্য আপনার কাছে অব্যাহতি কামনা করে না, বরং এ হল তাদের কাজ, আল্লাহ্ ও রোজ কিয়ামতের প্রতি যাদের ঈমান বিশুদ্ধ নয়। আর আল্লাহ্ মুত্তাকী লোকদের ভাল করে জানেন।

চতুর্থ আয়াতে মুনাফিকদের পেশকৃত ওযর যে মিথ্যা তার একটি আলামত দেখিয়ে বলা হয়েছে : وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً "জিহাদের জন্য বের হবার সংকল্প এদের থাকলে নিশ্চয় এর কিছু প্রস্তুতিও নিত" কিন্তু দেখা যায় যে, তাদের কোন প্রস্তুতিই নেই। এ থেকে বোঝা যায় যে, তাদের ওযর মিথ্যা বাহানা ছাড়া কিছুই নয়। বস্তুত জিহাদে বের হবার কোন ইচ্ছাই তাদের ছিল না।

গ্রহণযোগ্য ওযর ও জিহাদে বাহানার পার্থক্য : এ আয়াত থেকে একটি মূলনীতির সন্ধান পাওয়া যায়, যার দ্বারা প্রকৃত ওযর ও বাহানার মধ্যে পার্থক্য করা যাবে। তা হল সেই লোকদের ওযর প্রকৃত গ্রহণযোগ্য, যারা আদেশ পালনে প্রস্তুত, কিন্তু কোন আকস্মিক দুর্ঘটনার কবলে পড়ে অসমর্থ হয়ে পড়ে। মাযুরগণের সকল বিষয় এ নিরিখে যাচাই করা যাবে কিন্তু আদেশ পালনে যার কোন ইচ্ছা ও প্রস্তুতি নেই, পরে তার যদি কোন ওযরও উপস্থিত হয়, তবে গুনাহের এ ওযর হবে গুনাহের চাইতে নিকৃষ্ট। সুতরাং এ

ওযর গ্রহণযোগ্য নয়। কেউ জুম'আর নামাযে শরীক হওয়ার প্রস্তুতি নিয়েছে। কিন্তু যেইমাত্র চলার ইচ্ছা করল, হঠাৎ এক ঘটনায় তার গতি স্তব্ধ হয়ে গেল। এ ধরনের ওযর গ্রহণযোগ্য এবং এতে আল্লাহ্ মা'যুর লোকের পূর্ণ সওয়াব দান করেন। কিন্তু যে জুম'আর কোন প্রস্তুতিই নেয় নি, তার কোন ওযর উপস্থিত হলে তা হবে বাহানার নামান্তর।

উদাহরণত দেখা যায়, ভোরে ফজরের জামা'আতে শরীক হওয়ার প্রস্তুতি স্বরূপ ঘড়িতে এলার্ম দিয়ে রাখে, কিংবা সময় মত জাগাবার জন্য কাউকে নিয়োজিত রাখে, কিন্তু পরে দেখা যায়, ঘটনাচক্রে সকল চেষ্টাই ব্যর্থ। ফলে নামায কাযা হয়ে যায়। যেমন রসূলে করীম (সা)-এর লায়লাতুত তা'রীতের ঘটনা। সময় মত জেগে ওঠার জন্য তিনি হযরত বিলাল (রা)-কে নিয়োজিত রাখেন, যেন প্রত্যূষে সবাইকে জাগিয়ে দেন। কিন্তু ঘটনাচক্রে তাঁকেও তন্দ্রায় পেয়ে বসে। ফলে সূর্যোদয়ের পর সকলে চোখ খোলে---এ ওযর প্রকৃত ও গ্রহণযোগ্য। যে কারণে রসূলুল্লাহ (সা) সাহাবা কিরামকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন : لا تفريط فى النوم انما التفريط فى اليقظة অর্থাৎ "ঘুমের মধ্যে মানুষ মা'যুর। তাই এটি হল যা মানুষ জাগ্রত অবস্থায় করে।" সান্ত্বনার কারণ হল, সময় মত জেগে ওঠার সম্ভাব্য ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল। সারকথা এই যে, আদেশ পালনের প্রস্তুতি ও অপ্রস্তুতির মাধ্যমে কোন ওযর গ্রহণযোগ্য কিনা তা জানা যাবে। নিছক মৌখিক জমাখরচ দিয়ে কিছু লাভ হবে না।

পঞ্চম আয়াতে মিথ্যা ওযর দেখিয়ে অব্যাহতি লাভকারী মুনাফিকদের প্রসঙ্গে বলা হয় যে, জিহাদ থেকে এদের নিবৃত্ত থাকাই উত্তম। কারণ, ওখানে গেলে নানা ষড়যন্ত্র ও গুজবের মাধ্যমে সর্বত্র ফাসাদ সৃষ্টি করত। অতপর বলা হয় : وَفِيكُمْ سَمَّٰعُونَ لَهُمْ অর্থাৎ তোমাদের মাঝে আছে এমন এক সরলপ্রাণ মুসলমান, যারা তাদের মিথ্যা গুজবে বিভ্রান্ত হত।

لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِن قَبْلُ অর্থাৎ 'ইতিপূর্বেও তারা ফাসাদ সৃষ্টির প্রয়াস পেয়েছিল।' যেমন ওহুদ যুদ্ধ প্রভৃতিতে। وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَٰرِهُونَ অর্থাৎ "আল্লাহ্র বিজয় হল, যাতে মুনাফিকরা মর্মপীড়া বোধ করছিল।" এর দ্বারা ইঙ্গিত দেয়া হয় যে, জয়-বিজয় সবই আল্লাহ্র আয়ত্তে। যেমন ইতিপূর্বের যুদ্ধসমূহে আপনাকে জয়ী করা হয়েছে, তেমনি এ যুদ্ধেও জয়ী হবেন এবং মুনাফিকদের সমস্ত ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়ে পড়বে।

ষষ্ঠ আয়াতে জদ বিন কায়েস নামক জনৈক বিশিষ্ট মুনাফিকের এক বিশেষ বাহানার উল্লেখ করে তার গোমরাহীর বর্ণনা দেয়া হয়। সে জিহাদ থেকে অব্যাহতি লাভের জন্য ওযর পেশ করে বলেছিল, আমি এক পৌরুষদীপ্ত যুবক। রোমানদের

সাথে যুদ্ধে লড়তে গিয়ে তাদের সুন্দরী যুবতীদের মোহগ্রস্ত হয়ে পড়ার আশংকা রয়েছে। কোরআন মজীদ তার কথার উত্তরে বলেঃ أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا 'ভাল করে শোন' এই নির্বোধ এক সম্ভাব্য আশংকার বাহানা করে এক নিশ্চিত আশংকা অর্থাৎ রসূলের অবাধ্যতা ও জিহাদ পরিত্যাগের অপরাধের এখনই দণ্ডযোগ্য হয়ে গেল। وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ "আর নিঃসন্দেহে জাহান্নাম এই কাফিরদের পরিবেষ্টন করে আছে।" তা থেকে নিস্তার লাভের উপায় নেই। এর এক অর্থ এই হতে পারে যে, আখিরাতে জাহান্নাম এদের ঘিরে রাখবে। দ্বিতীয় অর্থ হতে পারে যে, জাহান্নামে পৌঁছার যে সকল কারণ এদেরকে বর্তমানে ঘিরে রেখেছে, সেগুলোই এখানে জাহান্নাম নামে অভিহিত। এ অর্থ মতে বলা যায়, এরা বর্তমানেও জাহান্নামের গণ্ডির মধ্যে রয়েছে।

সপ্তম আয়াতে এদের এক হীন স্বভাবের বর্ণনা দিয়ে বলা হয় যে, এরা যদিও বাহ্যত মুসলমানদের সাথে উঠাবসা রাখে, কিন্তু إِن تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ "আপনার কোন মঙ্গল দেখলে তাদের মুখ কাল হয়ে যায়।" وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ ... ... وَّهُمْ فَرِحُونَ এবং কোন বিপদ উপস্থিত হলে উল্লাস করে বলে যে, আমরা আগেভাগেই তা জানতাম যে, মুসলমানরা বিপদগ্রস্ত হবেই, তাই আমাদের জন্য যা কল্যাণকর, তাই অবলম্বন করেছি।

অষ্টম আয়াতে আল্লাহ্ পাক মহানবী (সা) ও মুসলমানদের মুনাফিকদের কথায় বিভ্রান্ত না হয়ে আসল সত্যকে সদা সামনে রাখার হিদায়ত দান করেছেন। ইরশাদ হয়েছেঃ قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا "আপনি ঐ বস্তু পূজারীদের বলে দিন যে, তোমরা ধোঁকায় পড়ে আছ। এ সব পার্থিব উপকরণ হল এক যবনিকা বিশেষ। এই যবনিকার অন্তরালে যে শক্তি সক্রিয় রয়েছে, তা আল্লাহ্রই। আমরা যে সকল অবস্থার সম্মুখীন হই তা আগেই আল্লাহ্ আমাদের জন্য নির্ধারিত করে রেখেছেন। তিনিই আমাদের কার্যনির্বাহক ও সাহায্যকারী। তাই মুসলমানদের আবশ্যক তাঁর প্রতি ভালবাসা রাখা এবং পার্থিব উপায় উপকরণকে নিছক মাধ্যম মনে করা, আর মনে করা যে, এগুলোর উপর ভালমন্দ নির্ভরশীল নয়।

তদবীর সহকারে তকদীরে বিশ্বাস করা কর্তব্য; বিনা তদবীরে তাওয়াক্কুল করা ভুলঃ আলোচ্য আয়াতটি তকদীর ও তাওয়াক্কুলের মূল তত্ত্বকে স্পষ্ট করে দিয়েছে। তকদীর ও তাওয়াক্কুল (আল্লাহ্র প্রতি ভরসা)-এর প্রতি বিশ্বাসের অর্থ এই নয় যে,

মানুষ হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকবে এবং বলবে যে, ভাগ্যে যা আছে তাই হবে। বরং তার অর্থ হল, সম্ভাব্য সকল উপায় অবলম্বনের সাধ্যমত চেষ্টা ও সাহস করে যাবে। এরপর বিষয়টিকে তকদীর ও তাওয়াক্কুলের উপর অর্পণ করবে আর দৃষ্টি আল্লাহ্র প্রতি নিবদ্ধ রাখবে। কারণ, চেষ্টা ও তদবীরের ফলাফল দানের মালিক হলেন তিনি।

তকদীর ও তাওয়াক্কুলের বিষয়টি নিয়ে যথেষ্ট বাড়াবাড়ি বিদ্যমান। ধর্মবিরোধী কিছু লোক আদতেই তকদীর ও তাওয়াক্কুলে বিশ্বাসী নয়। তারা পার্থিব উপায় উপ-করণকেই আল্লাহ্র স্থলাভিষিক্ত করে রেখেছে। অপর দিকে কিছু মূর্খ লোক, যারা নিজেদের দুর্বলতা ও অকর্মণ্যতা চাপা দেয়ার জন্য তকদীর ও তাওয়াক্কুলের আশ্রয় নেয়। জিহাদের জন্য নবী করীম (সা)-এর প্রস্তুতি, অতপর অত্র আয়াতের অবতরণ এ সকল বাড়াবাড়ির নিরসন করে সত্য পথ কি, তা দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে। ফার্সী প্রবাদ আছে : برتوكل زانوے اشتر به بند "তাওয়াক্কুলের মাধ্যমে উটের পা বেঁধে নাও।" অর্থাৎ দুনিয়ার উপায়-উপকরণও আল্লাহ্র নিয়ামত, এ নিয়ামতের সদ্ব্যবহার না করা হল নাশোকরী ও মূর্খতা। তবে উপায়-উপকরণকে ঠিক তাই মনে কর, ফলাফল তার অধীন নয় বরং আল্লাহ্র হুকুমের যে অধীন সে বিশ্বাস রাখবে।

শেষের আয়াতে মু'মিনদের এক বিরল শানের উল্লেখ করে তাদের বিপদে আনন্দ উপভোগকারী কাফিরদের বলা হয় যে, আমাদের যে বিপদ দেখে তোমরা এত উৎফুল্ল, তাকে আমরা বিপদই মনে করি না ; বরং তা আমাদের জন্য শান্তি ও সফলতার অন্যতম মাধ্যম। কারণ, মু'মিন আপন চেষ্টায় বিফল হলেও স্থায়ী সওয়াব ও প্রতিদান লাভের যোগ্য হয়, আর এটিই সকল সফলতার মূল কথা। তাই তারা অকৃতকার্য হলেও কৃতকার্য। তার ভাঙনে রয়েছে গড়ার প্রতিশ্রুতি। এই হল هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين "তোমারা কি আমাদের দু'টি মঙ্গলের একটির প্রতীক্ষায় আছ ?"

অপরদিকে কাফিরদের অবস্থা হল তার বিপরীত। আযাব থেকে কোন অবস্থায়ই তাদের অব্যাহতি নেই। এ জীবনেই তারা মুসলমানদের মাধ্যমে আল্লাহ্র আযাব ভোগ করবে এবং এভাবে তারা দুনিয়া ও আখিরাতের লাঞ্ছনা পোহাবে। আর যদি এ দুনি-য়ায় কোন প্রকারে নিষ্কৃতি পেয়েও যায়, তবে আখিরাতের আযাব থেকে রেহাই পাওয়ার কোন উপায় নেই ; তা অবশ্যই ভোগ করবে।

قُلْ اَنْفِقُوْا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا لَّنْ يُّتَقَبَّلَ مِنْكُمْ ؕ اِنَّكُمْ كُنْتُمْ
قَوْمًا فٰسِقِيْنَ ۝٥٣ وَمَا مَنَعَهُمْ اَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقٰتُهُمْ اِلَّآ اَنَّهُمْ
كَفَرُوْا بِاللّٰهِ وَبِرَسُوْلِهٖ وَلَا يَاْتُوْنَ الصَّلٰوةَ اِلَّا وَهُمْ كُسَالٰى

وَلَا يُنفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَٰرِهُونَ ﴿٥٤﴾ فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَٰلُهُمْ وَلَا
أَوْلَٰدُهُمْ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُم بِهَا فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا
وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَٰفِرُونَ ﴿٥٥﴾ وَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ إِنَّهُمْ
لَمِنكُمْ وَمَا هُم مِّنكُمْ وَلَٰكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ ﴿٥٦﴾ لَوْ يَجِدُونَ
مَلْجَـًٔا أَوْ مَغَٰرَٰتٍ أَوْ مُدَّخَلًا لَّوَلَّوْا۟ إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ ﴿٥٧﴾ وَ
مِنْهُم مَّن يَلْمِزُكَ فِى ٱلصَّدَقَٰتِ فَإِنْ أُعْطُوا۟ مِنْهَا رَضُوا۟
وَإِن لَّمْ يُعْطَوْا۟ مِنْهَآ إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ ﴿٥٨﴾ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا۟ مَآ
ءَاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَقَالُوا۟ حَسْبُنَا ٱللَّهُ سَيُؤْتِينَا ٱللَّهُ مِن
فَضْلِهِۦ وَرَسُولُهُۥٓ إِنَّآ إِلَى ٱللَّهِ رَٰغِبُونَ ﴿٥٩﴾

(৫৩) আপনি বলুন, তোমরা ইচ্ছায় অর্থ ব্যয় কর বা অনিচ্ছায়, তোমাদের থেকে তা কখনো কবুল হবে না, তোমরা নাফরমানের দল। (৫৪) তাদের অর্থ ব্যয় কবুল না হওয়ার এ ছাড়া আর কোন কারণ নেই যে, তারা আল্লাহ্ ও তার রসূলের প্রতি অবিশ্বাসী, তারা নামাযে আসে অলসতার সাথে আর ব্যয় করে সঙ্কুচিত মনে। (৫৫) সুতরাং তাদের ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন আপনাকে বিস্মিত না করে। আল্লাহ্র ইচ্ছা হল এগুলো দ্বারা দুনিয়ার জীবনে তাদের আযাবে নিপতিত রাখা এবং প্রাণ বিয়োগ হওয়া কুফরী অবস্থায়। (৫৬) তারা আল্লাহ্র নামে হলফ করে বলে যে, তারা তোমাদেরই অন্তর্ভুক্ত, অথচ তারা তোমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়, অবশ্য তারা তোমাদের ভয় করে। (৫৭) তারা কোন আশ্রয়স্থল, কোন গুহা বা মাথা গোঁজার ঠাঁই পেলে সেদিকে পলায়ন করবে দ্রুতগতিতে। (৫৮) তাদের মধ্যে এমন লোকও রয়েছে যারা সদকা বন্টনে আপনাকে দোষারোপ করে। এর থেকে কিছু পেলে সন্তুষ্ট হয় এবং না পেলে বিক্ষুব্ধ হয়। (৫৯) কতই না ভাল হত, যদি তারা সন্তুষ্ট হত আল্লাহ্ ও তার রসূলের উপর এবং বলত, আল্লাহ্ই আমাদের জন্য যথেষ্ট, আল্লাহ্ আমাদের দেবেন নিজ করুণায় এবং তার রসূলও, আমরা শুধু আল্লাহ্কেই কামনা করি।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আপনি (সেই মুনাফিকদের) বলুন, তোমরা (জিহাদ প্রভৃতিতে) ইচ্ছায় ব্যয় কর বা অনিচ্ছায়, তোমাদের থেকে তা কখনও (আল্লাহ্র দরবারে) কবুল হবে না,

(কারণ) তোমরা নাফরমানের দল (নাফরমান বলতে এখানে কাফির)। আর তাদের দান-খয়রাত কবুল না হওয়ার এছাড়া আর কোন কারণ নেই যে, তারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের সাথে কুফরী করেছে (আর কাফিরের আমল কবুল হওয়ার অযোগ্য।) এবং (গোপন কুফরীর প্রকাশ্য আলামত হলো এই যে,) তারা নামায আদায় করে অলসতার সাথে, আর (সৎকাজে) ব্যয় করে, কিন্তু কুন্ঠিত মনে (কারণ, তাদের অন্তরে ঈমান নেই ---যাতে সওয়াবের আশা করা যায়, আশা থাকলেই ইবাদতের স্পৃহা জাগে)। নিছক দুর্নাম থেকে বাঁচার জন্যই তারা অগত্যা যা কিছু করে (আর যখন তারা এভাবে প্রত্যাখ্যাত) তখন তাদের ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন আপনাকে বিস্মিত না করে [যে, এ প্রত্যাখ্যাত লোকদের এত ধনসম্পদ কিরূপে দেওয়া হল? কারণ, এগুলো আসলে নিয়ামত নয়; বরং এক ধরনের আযাব। কেননা, আল্লাহ্র ইচ্ছা হল এর দ্বারা দুনিয়ার জীবনে (-ও) তাদের আযাবে রাখা এবং কুফরী অবস্থায় তাদের মৃত্যুবরণ করা [যাতে আখিরাতেও আযাবে থাকে। সুতরাং যে ধনসম্পদের এহেন পরিণতি, তাকে নিয়ামত মনে করাই ভুল]। আর এই (মুনাফিক) লোকেরা আল্লাহ্র নামে হলফ করে বলে যে, আমরাও তোমাদের দলের (অর্থাৎ মুসলমান), অথচ (প্রকৃত প্রস্তাবে) তারা তোমাদের দলের নয়, তবে (অবস্থা এই যে,) তারা ভীত-সন্ত্রস্ত (তাই মিথ্যা হলফ করে নিজেদের কুফরীকে গোপন রাখছে, যেন অপরাপর কাফিরের সাথে মুসলমানদের যে আচরণ তা থেকে রেহাই পায়। তাদের আর কোথাও ঠাঁই পাওয়ার জায়গা নেই, যেখানে ইচ্ছা স্বাধীন মনে যেতে পারে। নতুবা) কোন আশ্রয়স্থল, কোন (গিরি) গুহা বা মাথা গুঁজবার স্থান যদি তারা পেত, তবে অবশ্যই সেদিকে ধাবিত হত (কিন্তু কোন পথ নেই, তাই মিথ্যা হলফ করে নিজেদের মুসলমান পরিচয় দিচ্ছে।) আর তাদের মধ্যে এমন লোকও রয়েছে যারা সদ্কা (বিলি-বন্টনের) ব্যাপারে আপনাকে দোষারোপ করে (যে, নাউযুবিল্লাহ! ন্যায্য বন্টন হল না,) কিন্তু যদি তারা সদ্কা থেকে (মনমত) অংশ পায়, তবে সন্তুষ্ট হয়, আর যদি (মনমত অংশ) না পায়, তবে বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। (এতে বোঝা যায় যে, তাদের আপত্তির মূলে রয়েছে দুনিয়ার লোভ ও স্বার্থপরতা।) আর তাদের জন্য কতইনা উত্তম হত, যদি তারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল যা দিয়েছেন, তার উপর সন্তুষ্ট হত এবং (সে সম্পর্কে) বলত, আমাদের জন্য আল্লাহ্ (এর দেয়াই) যথেষ্ট (এ রূপে যা পেলাম তাতে বরকত হবে। এরপর আরও প্রয়োজন ও তার ইচ্ছা হলে) ভবিষ্যতে আল্লাহ্ নিজ দয়ায় আরও দেবেন এবং তাঁর রসূল (সা)-ও দেবেন। আমরা (আন্তরিকভাবে) শুধু আল্লাহ্কেই কামনা করি (এবং তাঁর কাছেই সকল প্রত্যাশা রাখি)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে মুনাফিকদের কুস্বভাব ও মন্দ আচরণের আলোচনা ছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহের সারকথাও অনেকটা তাই। আর: إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ

لِيُعَذِّبَهُم بِهَا "আল্লাহ্‌র ইচ্ছা হল, এগুলোর দ্বারা তাদের আযাবে রাখা" বাক্যে মুনাফিকদের জন্য তাদের ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততিকে যে আযাব বলে অভিহিত করা হয়েছে, তার কারণ হল, দুনিয়ার মোহে উন্মত্ত থাকা মানুষের জন্য পার্থিব জীবনেও এক বড় আযাব। প্রথমে অর্থ উপার্জনের সুতীব্র কামনা, অতপর তা হাসিলের জন্য নানা চেষ্টা-তদবীর, নিরন্তর দৈহিক ও মানসিক পরিশ্রম, না দিনের আরাম, না রাতের ঘুম, না স্বাস্থ্যের হিফাযত আর না পরিবার-পরিজনের সাথে আমোদ-আহ্লাদের অবকাশ। অতপর হাড়ভাঙা পরিশ্রম দ্বারা যা কিছু অর্জিত হয়, তার রক্ষণাবেক্ষণ ও তাকে দ্বিগুণ-চতুর্গুণ বৃদ্ধি করার অবিশ্রান্ত চিন্তা-ভাবনা প্রভৃতি হল একেকটি স্বতন্ত্র আযাব। এরপর যদি কোন দুর্ঘটনা ঘটে বা রোগ-ব্যাধির কবলে পতিত হয়, তখন যেন আকাশ ভেঙে পড়ে। সৌভাগ্যক্রমে সবই যদি ঠিক থাকে এবং মনের চাহিদা মত অর্থকড়ি আসতে থাকে, তখন তার নিরাপত্তার প্রয়োজনও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায় এবং তখন সে চিন্তা ফিকির তাকে মুহূর্তের জন্যও আরামে বসতে দেয় না।

পরিশেষে এ সকল অর্থসম্পদ যখন মৃত্যুকালে বা তার আগে হাতছাড়া হতে দেখে, তখন দুঃখ ও অনুশোচনার অন্ত থাকে না। বস্তুত এসবই হল আযাব। অজ্ঞ মানুষ একে শান্তি ও আরামের সম্বল মনে করে। কিন্তু মনের প্রকৃত শান্তি ও তৃপ্তি কিসে, তার সন্ধান নেয় না। তাই শান্তির এই উপকরণকেই প্রকৃত শান্তি মনে করে তা নিয়েই দিবানিশি ব্যস্ত থাকে। অথচ প্রকৃতপক্ষে তা দুনিয়ার জীবনে তার আরামের শত্রু এবং আখিরাতের আযাবের পটভূমি।

কাফিরদের সদ্‌কা দেওয়া যায় কি? শেষের আয়াত থেকে প্রতীয়মান হয় যে, মুনাফিকরাও সদ্‌কার অংশ পেত। কিন্তু তাদের মনমত না পাওয়ায় ক্ষুব্ধ হয়ে নানা আপত্তি উত্থাপন করত। এখানে যদি সদ্‌কার সাধারণ অর্থ নেওয়া যায়, যে অর্থ অনুযায়ী সকল ওয়াজিব ও নফল সদ্‌কা বোঝায়, তবে কোন প্রশ্ন থাকে না। কারণ, অমুসলিমদের নফল সদ্‌কা দান ইমামদের ঐকমত্যে জায়েয এবং তা হাদীস দ্বারাও প্রমাণিত। আর যদি সদ্‌কা বলতে ফরয সদ্‌কা যথা, যাকাত ও ওশর প্রভৃতি বোঝানো হয়, তবে তা থেকে মুনাফিকদেরকেও এজন্য দেয়া হত যে, তারা নিজেদের মুসলমান রূপেই প্রকাশ করত এবং কুফরীর কোন প্রকাশ্য প্রমাণও তাদের থেকে পাওয়া যায়নি। আল্লাহ্ বিশেষ কোন উদ্দেশ্যে আদেশ দান করেন যে, তাদের সাথে মুসলমানদের অনুরূপ আচরণ করা হোক।—(বায়ানুল কোরআন)

لَا يَأْتُونَ الصَّلٰوةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالٰى "তারা নামাযে আসে না, কিন্তু আলস্যভরে"—আয়াতে মুনাফিকদের দু'টি আলামত বর্ণিত হয়েছে। নামাযে আলস্য ও দান খয়রাতে কুণ্ঠাবোধ। এতে মুসলমানদের প্রতি হুঁশিয়ারি প্রদান করা হয়েছে, যেন তারা মুনাফিকদের এই দু'প্রকার অভ্যাস থেকে দূরে থাকে।

إِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْعٰمِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ
قُلُوْبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغٰرِمِيْنَ وَفِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ؕ
فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ۝٦٠

(৬০) যাকাত হল কেবল ফকীর, মিসকীন, যাকাত আদায়কারী ও যাদের চিত্ত আকর্ষণ প্রয়োজন তাদের হক এবং তা দাস-মুক্তির জন্য, ঋণগ্রস্তদের জন্য আল্লাহ্র পথে জিহাদকারীদের জন্য এবং মুসাফিরদের জন্য এই হল আল্লাহ্র নির্ধারিত বিধান। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময়।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(ফরয) সদ্কা কেবল গরীব, মুহ্তাজ, যাকাত আদায়ের কাজে নিয়োজিত ও যাদের চিত্ত আকর্ষণ আবশ্যক তাদের হক এবং তা (ব্যয় করা হবে) দাস মুক্তির জন্য, ঋণগ্রস্তদের ঋণ আদায়ে, জিহাদকারীদের (অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহের) জন্য এবং মুসাফিরের (সাহায্যের) জন্য। এই হল আল্লাহ্র নির্ধারিত হুকুম, আর আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সদ্কার ব্যয় খাত: উপরোক্ত আয়াতসমূহে সদ্কা সম্পর্কে নবী করীম (সা)-এর উপর মুনাফিকদের আপত্তির বর্ণনা ও তার জবাব। মুনাফিকরা অপবাদ রটাত যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) (নাউযুবিল্লাহ!) সদ্কা বন্টনে স্বজনপ্রীতির আশ্রয় নিয়েছেন এবং যাকে যা ইচ্ছা দিয়ে চলেছেন।

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ পাক সদ্কা ব্যয়-খাত ঠিক করে দিয়ে তাদের সন্দেহ নিরসন করেছেন এবং কারা সদ্কা পাওয়ার উপযুক্ত তা বাতলে দিয়েছেন। আর দেখিয়ে দিয়েছেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) আল্লাহ্র হুকুম মতেই সদ্কার বিলি-বন্টন করছেন; নিজের খেয়াল-খুশি মত নয়।

হাদীস গ্রন্থ আবূ দাউদ ও দারে কুতনী গ্রন্থে বর্ণিত এবং হযরত যিয়াদ বিন হারিছ ছদরী কর্তৃক রেওয়ায়েতকৃত এক হাদীস দ্বারাও এ সত্যটি প্রমাণিত হয়। রেও-য়ায়েতকারী বলেন, আমি একদা রসূলে করীম (সা)-এর খিদমতে হাযির হয়ে জানতে পারলাম যে, তিনি তাঁর গোত্রের সাথে যুদ্ধ করার জন্য সৈন্যের একটি দল অচিরে প্রেরণ করবেন। আমি আরয করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি বিরত হোন, আমি দায়িত্ব নিচ্ছি যে, তারা সবাই আপনার বশ্যতা স্বীকার করে এখানে হাযির হবে। অতপর

আমি স্বগোত্রের কাছে পত্র প্রেরণ করি। পত্র পেয়ে তারা সবাই ইসলাম গ্রহণ করে। এর প্রেক্ষিতে হযরত (সা) আমাকে বলেন, يا اخا صداء المطاع فى قومه অর্থাৎ "তুমি তোমার গোত্রের একান্ত প্রিয় নেতা।" আমি আরয করলাম, এতে আমার কৃতিত্বের কিছুই নেই। আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে তারা হিদায়ত লাভ করে মুসলমান হয়েছে। রেওয়ায়েত-কারী বলেন, আমি এই বৈঠকে থাকাবস্থায়ই এক ব্যক্তি এসে হযরত (সা)-এর কাছে কিছু সাহায্য প্রার্থনা করল। হুযুর (সা) তাকে জবাব দিলেন ঃ

"সদ্‌কার ভাগ-বাটোয়ারার দায়িত্ব আল্লাহ্‌ নবী বা অন্য কাউকে দেননি। বরং তিনি নিজেই সদ্‌কার আটটি খাত নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। এই আট শ্রেণীর কোন একটিতে তুমি শামিল থাকলে দিতে পারি।"—(কুরতুবী পৃঃ ১৬৮, খণ্ড—১)।

এই হল আয়াতের শানে-নুযুল। এর তফসীর ও ব্যাখ্যা দানের আগে মনে রাখতে হবে যে, আল্লাহ্‌ পাক কোরআন মজীদে সকল প্রাণীর রিযিক সরবরাহের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। কিন্তু নিজের অপার হিকমতের প্রেক্ষিত ধনী-দরিদ্রের পার্থক্য রেখেছেন ; সবাইকে সমান রিযিক দেননি। এই পার্থক্য রাখার মধ্যে রয়েছে মানুষের চরিত্র বিন্যাস এবং বিশ্ব পরিচালনা সম্পর্কিত বহুবিধ রহস্য। যার বিস্তারিত বর্ণনা এখানে তুলে ধরা সম্ভব নয়। আল্লাহ্‌ সেই হিকমতগুণে কাউকে করেছেন ধনী এবং কাউকে গরীব। কিন্তু ধনীর অর্থ-সম্পদে নির্দিষ্ট রেখেছেন গরীবের অংশ। এক আয়াতে আছে ঃ وَفِىٓ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّآئِلِ وَالْمَحْرُوْمِ অর্থাৎ ধনীদের সম্পদে রয়েছে ফকির বঞ্চিতদের অধিকার (সূরা যারিয়াত)। এতে বলা হয়েছে যে, ধনীদের সম্পদে গরীবদের একটি নির্দিষ্ট অংশ রয়েছে আর এ হল তাদের হক।

এ থেকে বোঝা যায় যে, ধনীরা যে দান-খয়রাত করে, তা তাদের ইহ্‌সান নয়, বরং এটি গরীবদের হক, যা আদায় করা তাদের কর্তব্য। দ্বিতীয়ত, এ হক আল্লাহ্‌ নিজেই নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। কেউ নিজের খেয়াল-খুশি মত তাতে কম-বেশি করতে পারবে না। আল্লাহ্‌ নির্দিষ্ট হকের পরিমাণ এবং তা বাতলানোর কাজটি আপন রসূলের ওপর সোপর্দ করেছেন। তিনিও এ কাজটিকে এত গুরুত্ব দিয়েছেন যে, তা সাহাবা কিরামকে মৌখিক বলেই যথেষ্ট মনে করেননি এবং এ বিষয়ের বিস্তারিত ব্যাখ্যা সম্বলিত ফরমান লিখে হযরত উমর ফারূক ও আমর বিন হায্‌ম্‌ (রা)-কে সোপর্দ করেছেন। এতে পরিষ্কার প্রমাণিত হয় যে, যাকাতের নিসাব এবং প্রত্যেক নিসাবে যাকাতের যে হার তা চিরদিনের জন্য আল্লাহ্‌ আপন রসূলের মাধ্যমে নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। এতে কোন যুগে বা কোন দেশে কম-বেশি বা রদবদল করার অধিকার কারো নেই।

নির্ভরযোগ্য তথ্য মতে মক্কায় ইসলামের প্রাথমিক অবস্থায় যাকাত ফরয হওয়ার আদেশ নাযিল হয়। তফসীরে ইবনে কাসীর সূরা মুযযাম্মিলের আয়াত ঃ فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ ('সুতরাং নামায কায়েম কর ও যাকাত আদায় কর')—দ্বারা তাই

প্রমাণ করা হয়। কারণ, সূরাটি ইসলামের প্রাথমিক অবস্থায় নাযিল হয়। তবে বিভিন্ন হাদীস থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ইসলামের শুরুতে যাকাতের বিশেষ নিসাব বা বিশেষ হার নির্ধারণ করা হয়নি, বরং প্রয়োজনের অতিরিক্ত যা থাকত, তা মুসলমানগণ মুক্ত হস্তে আল্লাহ্‌র রাহে দান করে দিতেন। হিজরতের পরে মদীনা শরীফে যাকাতের নিসাব ও হার নির্ধারণ করা হয় এবং মক্কা বিজয়ের পর সদ্‌কা ও যাকাত আদায়ের সুষ্ঠু নিয়ম-নীতি প্রবর্তন করা হয়।

সাহাবা ও তাবেয়ীগণের ঐকমত্যে অত্র আয়াতে সেই ওয়াজিব সদ্‌কার খাতগুলোর বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, যা মুসলমানদের জন্য নামাযের মতই ফরয। কারণ, এ আয়াতে নির্ধারিত খাতগুলো ফরয সদ্‌কারই খাত। হাদীস মতে নফল সদ্‌কা আট খাতের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় বরং এর পরিসর আরও প্রশস্ত।

যদিও পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে সাধারণ অর্থেই সদ্‌কা শব্দের ব্যবহার করা হয়েছে যার মধ্যে ওয়াজিব ও নফল উভয় সদ্‌কাই শামিল রয়েছে, তবে অত্র আয়াতে ইমামদের ঐকমত্যে কেবল ফরয সদ্‌কার খাতসমূহের উল্লেখ রয়েছে। তফসীরে কুরতুবীতে উল্লেখ আছে যে, কোরআনে যে সব স্থানে 'সদ্‌কা' শব্দের ব্যবহার রয়েছে, সেখানে নফল সদ্‌কার কোন আলামত না থাকলে ফরয সদ্‌কাই উদ্দেশ্য হবে।

আলোচ্য আয়াতের শুরুতে إِنَّمَا (কেবল) শব্দ আনা হয়। তাই শুরু থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে, সদ্‌কার যে সব খাতের বর্ণনা সামনে দেওয়া হচ্ছে কেবল সে খাতগুলোতেই সকল ওয়াজিব সদ্‌কা ব্যয় করা হবে। এছাড়া অন্য কোন ভাল খাতেও ওয়াজিব সদ্‌কা ব্যয় করা যাবে না। যেমন, জিহাদের প্রস্তুতি, মসজিদ ও মাদ্রাসা নির্মাণ কিংবা জনকল্যাণমূলক সংস্থা প্রভৃতি। এগুলোও যে ভাল ও আবশ্যকীয় এবং তাতে ব্যয় করা যে বড় সওয়াবের কাজ, তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু যে সকল সদ্‌কার হার নির্দিষ্ট, তা এ সকল কাজে ব্যয় করা যাবে না।

আয়াতের দ্বিতীয় শব্দ 'সাদাকাত' হল 'সদ্‌কা'র বহুবচন। আরবী অভিধানে আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে সম্পদের যে অংশ ব্যয় করা হয়, তাকে সদ্‌কা বলা হয় (কামূস)। ইমাম রাগিব (র) 'মুফরাদাতুল কোরআন' গ্রন্থে বলেন, দানকে সদ্‌কা বলা হয় এজন্য যে, দানকারী প্রকারান্তরে দাবি করে যে, কথা ও কাজে সে সত্যবাদী এবং কোন পার্থিব স্বার্থে নয়, বরং আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেই তার এই দান-খয়রাত। সুতরাং যে দানের সাথে দুনিয়ার স্বার্থ বা রিয়া যুক্ত থাকে, কোরআনে সে দানকে ব্যর্থ বলে গণ্য করেছে।

সদ্‌কা শব্দটি ব্যাপক অর্থবোধক। নফল ও ফরয উভয় দানই এতে শামিল রয়েছে। নফলের জন্য শব্দটির প্রচুর ব্যবহার, তেমনি ফরয সদ্‌কার ক্ষেত্রেও কোরআনের বহুস্থানে শব্দটির ব্যবহার দেখা যায়। যেমন, خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً এবং আলোচ্য

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ আয়াত প্রভৃতি। বরং আল্লামা কুরতুবী (র)-এর তত্ত্ব মতে কোরআনে যেখানে শুধু সদ্কা শব্দের ব্যবহার রয়েছে, সেখানে ফরয সদ্কা উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। আবার কতিপয় হাদীসে সদ্কা বলতে প্রত্যেক সৎকর্মকেও বোঝানো হয়েছে। যেমন, হাদীস শরীফে আছে, "কোন মুসলমানের সাথে হৃষ্ট চিত্তে সাক্ষাৎ করাও সদ্কা, কোন বোঝা বহনকারীর কাঁধে বোঝা তুলে দেওয়াও সদ্কা। কূপ থেকে নিজের জন্য উত্তোলিত পানির কিছু অংশ অন্যকে দান করাও সদ্কা।" এ হাদীসে সদ্কা শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে।

আলোচ্য আয়াতের তৃতীয় শব্দ হল لِلْفُقَرَاءِ এর শুরুতে ل (লাম) বর্ণটি উদ্দেশ্য নির্ধারণের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। তাই বাক্যের অর্থ হবে, সকল সদ্কা সেই লোকদেরই হক, যাদের উল্লেখ পরে রয়েছে।

আট খাতের বিবরণ ঃ প্রথম ও দ্বিতীয় খাত হল যথাক্রমে ফকীর ও মিসকীনের। আসল অর্থে যদিও পার্থক্য রয়েছে। একটির অর্থ হল যার কিছুই নেই এবং অপরটির অর্থ হল যে নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক নয়। তবে যাকাতের হুকুমে সমান। মোট কথা, যার কাছে প্রয়োজনের অতিরিক্ত নিসাব পরিমাণ অর্থ নেই, তাকে যাকাত দেওয়া যাবে এবং সেও নিতে পারবে। প্রয়োজনীয় মালামালের মধ্যে থাকার ঘর, ব্যবহৃত বাসন-পেয়ালা, পোশাক-পরিচ্ছদ ও আসবাবপত্র প্রভৃতি শামিল রয়েছে।

সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণ কিংবা সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপা বা তার মূল্য যার কাছে রয়েছে এবং যে ঋণগ্রস্ত নয়, সে নিসাবের মালিক। তাকে যাকাত দেয়া ও তার পক্ষে যাকাত নেয়া জায়েয নয়। অনুরূপ, যার কাছে কিছু রূপা বা নগদ কিছু টাকা এবং কিছু স্বর্ণ আছে—সব মিলে যদি সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপার সমমূল্য হয়, তবে সেও নিসাবের মালিক, তাকেও যাকাত দেয়া ও তার নেয়া জায়েয নয়। তবে এ হিসাবে যে নিসাবের মালিক নয়, কিন্তু স্বাস্থ্যবান, উপার্জনক্ষম এবং একদিনের খাবার সংস্থানও তার রয়েছে, তাকে যাকাত দেয়া অবশ্য জায়েয, কিন্তু ভিক্ষাবৃত্তি তার জন্য জায়েয নয়। এ ধরনের লোকের পক্ষে মানুষের কাছে হাত পাতা হারাম। এ ব্যাপারে অনেকের অসাবধানতা রয়েছে। এ ধরনের লোকেরা হাত পেতে যা লাভ করে, তাকে রসূলুল্লাহ্ (সা) জাহান্নামের অঙ্গার বলে অভিহিত করেছেন।—[আবূ দাউদ, আলী (রা) হতে কুরতুবী]

সারকথা, যাকাতের বেলায় ফকীর-মিসকীনের কোন প্রভেদ নেই। তবে অসিয়তের বেলায় প্রভেদ রয়েছে। অর্থাৎ কেউ যদি মিসকীনদের জন্য কিছু অসিয়ত করে, তবে কোন্ ধরনের লোকদের দেওয়া যাবে এবং ফকীরদের জন্য অসিয়ত করলে কোন্ শ্রেণীকে দিতে হবে, এখানে তার উল্লেখের প্রয়োজন নেই। তবে ফকীর বা মিসকীন যাকেই যাকাত দেয়া হোক, লক্ষ্য রাখতে হবে, সে যেন মুসলমান হয় এবং প্রয়োজনের অতিরিক্ত নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক যেন না হয়।

অবশ্য সাধারণ সদ্‌কা অমুসলিমদেরও দেওয়া যায়। হাদীস শরীফে আছেঃ تصدقوا على اهل الاديان كلها "যে কোন ধর্মের লোককে দান কর।" কিন্তু যাকাত সম্পর্কে রসূল করীম (সা) হযরত মু'আয (রা)-কে ইয়ামেন প্রেরণকালে হিদায়ত দিয়েছিলেন যে, যাকাতের অর্থ শুধু মুসলিম ধনীদের থেকে নেয়া হবে এবং মুসলিম গরীবদেরকে দেয়া হবে। তাই যাকাতের অর্থ শুধু মুসলমান ফকীর-মিসকীনদের মধ্যে বন্টন করতে হবে। যাকাত ব্যতীত অন্যান্য সদ্‌কা-খয়রাত এমনকি সদকায়ে ফিতরও অমুসলিমদের দেওয়া জায়েয রয়েছে। —(হেদায়াহ্)

দ্বিতীয় শর্ত নিসাবের মালিক না হওয়া। আর তার ফকীর বা মিসকীন শব্দের অর্থের দ্বারাই প্রকাশ পায়। কেননা, তার নিকট হয় কিছুই থাকবে না অথবা নিসাবের পরিমাণ থেকে কম থাকবে। সুতরাং ফকীর ও মিসকীনের মধ্যে নিসাব পরিমাণ মালের মালিক না হওয়ার ব্যাপারে কোন পার্থক্য নেই। যাই হোক, এই খাতের পর আরো ছয়টি খাতের বর্ণনা রয়েছে যার প্রথমটি হল 'আমেলীনে সদ্‌কা' অর্থাৎ সদ্‌কা আদায়কারী। এরা ইসলামী সরকারের পক্ষ হতে লোকদের কাছ থেকে যাকাত ও ওশর প্রভৃতি আদায় করে বায়তুলমালে জমা দেয়ার কাজে নিয়োজিত থাকে। এরা যেহেতু এ কাজে নিজেদের সময় ব্যয় করে, সেহেতু তাদের জীবিকা নির্বাহের দায়িত্ব ইসলামী সরকারের উপর বর্তায়। কোরআন মজীদের উপরোক্ত আয়াত যাকাতের একাংশ তাদের জন্য রেখে এ কথা পরিষ্কার করে দিয়েছে যে, তাদের পারিশ্রমিক যাকাতের খাত থেকেই আদায় করা হবে।

এর মূল রহস্য হল এই যে, আল্লাহ্ পাক মুসলমানদের থেকে যাকাত ও অপরাপর সদ্‌কা আদায়ের দায়িত্ব দিয়েছেন রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে। অত্র সূরার শেষের দিকে এক আয়াতে বলা হয়েছেঃ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً "হে রসূল, আপনি তাদের মালামাল থেকে সদ্‌কা আদায় করুন।" এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা পরে আসবে। এখানে এতটুকু বলে রাখি যে, উক্ত আয়াত মতে আমীরুল মু'মিনীনের উপর যাকাত ও সদ্‌কা আদায়ের দায়িত্ব বর্তায়। বলা বাহুল্য, সহকারী ব্যতীত আমীরের পক্ষে এ দায়িত্ব সম্পাদন করা সম্ভব নয়। আলোচ্য আয়াতে যাকাত আদায়কারী তথা সেই সহকারীদের কথাই বলা হয়েছে।

এ আয়াত মতে নবী করীম (সা) অনেক সাহাবীকে বিভিন্ন স্থানে যাকাত আদায়ের জন্য প্রেরণ করেছিলেন এবং আদায়কৃত যাকাত থেকেই তাদের পারিশ্রমিক দিতেন। এ সকল সাহাবার মধ্যে অনেকে ধনীও ছিলেন। হাদীস শরীফে আছেঃ ধনীদের জন্য সদ্‌কার অর্থ হালাল নয়, তবে পাঁচ ব্যক্তির জন্য হালাল। প্রথমত, যে জিহাদের উদ্দেশ্যে বের হয়েছে কিন্তু সেখানে প্রয়োজনীয় অর্থ তার নেই, যদিও সে স্বদেশে ধনী। দ্বিতীয়ত, সদ্‌কা আদায়ের দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তি। তৃতীয়ত, সেই অর্থশালী ব্যক্তি, যার মওজুদ অর্থের তুলনায় ঋণ অধিক। চতুর্থত, যে ব্যক্তি মূল্য আদায় করে গরীব-মিসকীন থেকে

সদ্কার মালামাল ক্রয় করে। পঞ্চমত, যাকে গরীব লোকেরা সদ্কার প্রাপ্ত মাল হাদিয়াস্বরূপ প্রদান করে।

সদ্কা আদায়কারীদের কি পরিমাণ পারিশ্রমিক দেয়া হবে সে প্রশ্ন আসা স্বাভাবিক। এ ব্যাপারে হুকুম হল, তাদের কাজ ও পরিশ্রম অনুসারে পারিশ্রমিক দেয়া হবে।—(আহ্কামুল কোরআন—জাস্সাস, কুরতুবী) তবে তাদের পারিশ্রমিক আদায়কৃত যাকাতের অর্ধাংশের বেশি দেয়া যাবে না। যাকাতের আদায়কৃত অর্থ যদি এত অল্প হয় যে, আদায়কারীদের বেতন দিয়ে তার অর্ধেকও বাকি থাকে না, তবে বেতনের হার হ্রাস করতে হবে। অর্ধেকের বেশি বেতন খাতে ব্যয় করা যাবে না—(তফসীরে মাযহারী, যহীরিয়া)।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে বোঝা গেল যে, যাকাত তহবীল থেকে আদায়কারীদের যে বেতন দেয়া হয়, তা সদ্কা হিসেবে নয়, বরং পরিশ্রমের বিনিময় হিসেবেই দেয়া হয়। তাই তারা ধনী হলেও এ অর্থের উপযুক্ত এবং যাকাত থেকে তাদের দেয়া জায়েয। আট প্রকারের ব্যয়খাতের মধ্যে এই একটি খাতই এমন যে, সেখানে স্বয়ং যাকাতের অর্থ পারিশ্রমিক রূপে দেয়া যায়। অথচ, যাকাত সে দানকেই বলা হয়, যা কোন বিনিময় ছাড়াই গরীবদের প্রদান করা হয়। সুতরাং কোন গরীবকে কাজের বিনিময়ে যাকাতের অর্থ দিলে যাকাত আদায় হবে না।

এখানে দু'টি প্রশ্ন উঠতে পারে। প্রথমত, যাকাত আদায়কারীদের কাজের বিনিময়ে কিরূপে যাকাতের অর্থ দেয়া যাবে। দ্বিতীয়ত, ধনীর জন্য যাকাতের অর্থ কিভাবে হালাল হবে। উভয় প্রশ্নের উত্তর একটিই। তাহল এই যে, সদ্কা আদায়-কারীদের আসল পরিচয় জেনে নিতে হবে। তারা আসলে গরীবদেরই উকীলস্বরূপ। বলা বাহুল্য, উকীল কিছু গ্রহণ করলে তা মক্কেলের গ্রহণ বলেই গণ্য হয়। কেউ যদি অন্য লোককে কারো থেকে কর্জ আদায়ের জন্য উকীল নিযুক্ত করে তবে কর্জের টাকা উকীলের হাতে অর্পণ করলেও যেমন কর্জদার দায়িত্ব মুক্ত হয়, তেমনি গরীবদের উকীল হিসেবে আদায়কারীর মাধ্যমে সদ্কা আদায় করলেও ধনীদের যাকাত আদায় হয়ে যাবে। অতপর উকীল হিসেবে সদ্কার যে অর্থ তারা সংগ্রহ করবে, গরীবরাই তার মালিক হবে। এরপর যাকাতের অর্থ থেকে আদায়কারীর যে বেতন দেয়া হয়, তা আসলে গরীবদের পক্ষ থেকেই ধনীদের পক্ষ থেকে নয়। গরীবরা যাকাতের অর্থ দিয়ে যা ইচ্ছা করতে পারে। সুতরাং যাকাতের অর্থ দ্বারা তাদের উকীলদের পারিশ্রমিক দেয়ার অধিকারও তাদের থাকবে।

অতপর প্রশ্ন আসে যে, সদ্কা আদায়কারীদের তো গরীবরা উকীল নিযুক্ত করেনি, তারা কেমন করে উকীল সেজে বসল? জবাব হল যে, ইসলামী রাষ্ট্রের আমীর স্বাভাবিকভাবেই আল্লাহ্র পক্ষ থেকে সে দেশের সকল গরীব-মিসকীনের উকীল। কারণ, এদের ভরণ-পোষণের সমুদয় দায়িত্ব তাঁর। তিনি সদ্কা আদায়ের জন্য যাদের নিযুক্ত করেন, তারা তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে গরীবদেরও উকীল সাব্যস্ত হয়।

এ থেকে বোঝা যায় যে, সদ্‌কা আদায়কারীদের বেতন হিসেবে যা দেয়া হয় তা মূলত যাকাতের টাকা নয়, বরং যাকাত যে গরীবদের হক, সেই গরীবদের পক্ষ থেকে তা কাজের বিনিময় মাত্র। যেমন, কোন গরীব লোক যদি কাউকে তার মামলা পরিচালনার জন্য উকীল নিযুক্ত করে এবং তাকে এ কাজের জন্য যাকাতের টাকা থেকে মজুরি দেয়, এখানে এ মজুরি যাকাত হিসেবে দেয়াও হচ্ছে না আর যাকাত হিসেবে নেয়াও হচ্ছে না।

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ এখানে উল্লেখযোগ্য যে, বর্তমান যুগে ইসলামী মাদ্রাসা এবং সে জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর পরিচালক বা তাদের প্রতিনিধিরা সদ্‌কা ও যাকাত যে ধনীদের থেকে আদায় করেন, তারা উপরোক্ত হুকুমের অন্তর্ভুক্ত নন। তাই যাকাত সদ্‌কা থেকে তাদের বেতন-ভাতা আদায় করা যাবে না; বরং ভিন্ন খাত থেকে তার ব্যবস্থা করতে হবে। কারণ, তারা ধনীদের উকীল, গরীবদের নয়। ধনীদের পক্ষ থেকেই যাকাতের টাকা উপযুক্ত খাতে ব্যয় করার অধিকার তাদের দেয়া হয়েছে। সুতরাং যাকাতের টাকা তাদের হস্তগত হওয়ার পর সঠিক স্থানে ব্যয় না করা পর্যন্ত দাতাদের যাকাত আদায় হবে না।

তারা যে গরীবদের উকীল নয়, তা সুস্পষ্ট। কারণ, কোন গরীব তাদের উকীল নিযুক্ত করেননি এবং আমীরুল মু'মিনীনের প্রতিনিধিত্বও তারা করে না। তাই তাদের পক্ষে ধনীদের উকীল হওয়া ব্যতীত আর কোন পথ খোলা নেই। সুতরাং যাকাত খাতে ব্যয় হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত যাকাতের টাকা তাদের হাতে থাকা ও মালিকের হাতে থাকার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।

এ ব্যাপারে সাধারণত সাবধানতা অবলম্বন করা হয় না। বহু প্রতিষ্ঠান যাকাতের বিস্তর টাকা সংগ্রহ করে বছরের পর বছর সিন্ধুকে তালাবদ্ধ করে রাখে। আর যাকাত-দাতারা মনে করে যে, যাকাত আদায় হয়ে গেল। অথচ তাদের যাকাত আদায় হবে তখনই, যখন তা যাকাতের খাতসমূহে ব্যয়িত হবে।

অনুরূপ অনেকে বর্তমান যুগের যাকাত আদায়কারীদের আমীরুল মু'মিনীনের প্রতিনিধিবর্গের সাথে তুলনা করে যাকাতের অর্থ থেকে তাদের বেতন আদায় করে। একান্ত-ভাবেই এটি অজ্ঞতাপ্রসূত। দাতা ও গ্রহীতা কারো পক্ষেই তা জায়েয নয়।

ইবাদতের পারিশ্রমিক গ্রহণ ঃ এখানে আর একটি প্রশ্ন আসে। কোরআনের ইশারা-ইঙ্গিত এবং হাদীসের স্পষ্ট উক্তি দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, কোন ইবাদতের বিনিময়ও মজুরি নেয়া হারাম। মসনদে আহমদে বর্ণিত এক হাদীসে ইরশাদ হয়েছে ঃ اقرؤا القرآن ولا تاكلوا به অর্থাৎ "কোরআন পাঠ কর, কিন্তু কোরআনকে উপার্জনের মাধ্যমে পরিণত করো না।" অপর হাদীসে কোরআন দ্বারা উপার্জিত বস্তুকে জাহান্নামের অংশ বলা হয়েছে। এসব হাদীসের প্রেক্ষিতে ফেকাহ্ শাস্ত্রবিদরা একমত যে, ইবাদত-বন্দেগীর পারিশ্রমিক নেয়া জায়েয নয়। সুতরাং বলা যায়, সদ্‌কা-খয়রাত

আদায় করাও ইবাদত ও দীনের একটি সেবা। রসূলে করীম (সা) একে এক প্রকারের জিহাদ বলে অভিহিত করেছেন। তাই এ ইবাদতের মজুরি গ্রহণ করাও হারাম হওয়া সঙ্গত। অথচ কোরআনের আলোচ্য আয়াতটি তা স্পষ্টরূপে জায়েয করে দিয়েছে এবং যাকাতের আট খাতের মধ্যে একেও শামিল করেছে।

ইমাম কুরতুবী (র) তাঁর তফসীরে বলেন, যে ইবাদত ফরযে আইন বা ওয়াজেবে আইন, তার পারিশ্রমিক নেয়া সর্বাবস্থায় হারাম। কিন্তু যে ইবাদত ফরযে কেফায়াহ্, তার বিনিময় নেয়া এ আয়াত মতে জায়েয। ফরযে কেফায়াহ্ হল, যা সকল উম্মত বা শহরের সকল বাসিন্দার জন্য ফরয, কিন্তু সকলের আদায় করা জরুরী নয়; কিছু লোক আদায় করলে সবাই দায়িত্ব মুক্ত হয়। কিন্তু কেউ আদায় না করলে সবাই গুনাহ্গার হয়।

ইমাম কুরতুবী (র) বলেন, "এ আয়াত মতে ইমামতি ও ওয়ায-নসীহতের পারিশ্রমিক নেয়াও জায়েয রয়েছে। কারণ, এগুলো ওয়াজেবে আইন নয়; বরং ওয়াজেবে কেফায়াহ।" অনুরূপ কোরআন-হাদীস ও অপরাপর দীনী ইলমের তালীম ও প্রচার সকল উম্মতের জন্যই ফরযে কেফায়াহ। কতিপয় লোক তা আদায় করলে সকলেই দায়িত্ব মুক্ত হয়ে যায়। তাই এ সব ইবাদতের বিনিময় নেয়া জায়েয।

যাকাতের চতুর্থ ব্যয়খাত হল 'মুআল্লাফাতুল কুলুব'। সাধারণত তারা তিনচার শ্রেণীর বলে উল্লেখ করা হয়। এদের কিছু মুসলমান, কিছু অমুসলমান। মুসলমানদের মধ্যে কেউ ছিল পরম অভাবগ্রস্ত এবং নওমুসলিম, এদের চিত্তাকর্ষণের ব্যবস্থা এজন্যে নেয়া হয়, যেন তাদের ইসলামী বিশ্বাস পরিপক্ক হয়। আর কেউ ছিল ধনী, কিন্তু তাদের অন্তর তখনো ইসলামে রঞ্জিত হয়নি। আর কেউ কেউ ছিল পরিপক্ক মুসলমান, কিন্তু তার গোত্রকে এর দ্বারা হিদায়তের পথে আনা উদ্দেশ্য ছিল। অমুসলমানদের মধ্যেও এমন অনেকে রয়েছে, যাদের শত্রুতা থেকে বাঁচার জন্য তাদের পরিতুষ্ট রাখার প্রয়োজন ছিল। আর কেউ ছিল, যারা ওয়ায-নসীহত কিংবা যুদ্ধ ও শক্তি প্রয়োগ দ্বারাও ইসলামে প্রভাবিত হচ্ছে না, বরং অভিজ্ঞতার আলোকে দেখা যাচ্ছে যে, তারা দয়া, দান ও সদ্ব্যবহারে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে। রসূলে করীম (সা)-এর সমগ্র জীবনের ব্রত ছিল কুফরীর অন্ধকার থেকে আল্লাহ্র বান্দাদের ঈমানের আলোকে নিয়ে আসা। তাই এ ধরনের লোকদের প্রভাবিত করার জন্য যে কোন বৈধ পন্থা অবলম্বন করতেন। এরা সবাই মুআল্লাফাতুল কুলুবের অন্তর্ভুক্ত এবং আলোচ্য আয়াতে এদেরকে সদ্কার চতুর্থ ব্যয়খাত রূপে অভিহিত করা হয়।

ইতিপূর্বে বলা হয়েছে যে, এদের চিত্তাকর্ষণের জন্য সদ্কার অংশ দেয়া হত। সাধারণ ধারণা মতে মুসলিম-অমুসলিম উভয় শ্রেণীই এতে রয়েছে। অমুসলিমদের চিত্তাকর্ষণ করা হয় ইসলামের প্রতি উৎসাহিত করার জন্য, আর নওমুসলিমদের পরিতুষ্ট করা হয় ইসলামের উপর অবিচল রাখার জন্য। জনশ্রুতি রয়েছে যে, নবী যুগে উল্লিখিত বিশেষ কারণে এদের সদ্কা দান করা হত। কিন্তু হযরত (সা)-এর

ওফাতের পর যখন ইসলামের শক্তি বৃদ্ধি পায় এবং কাফিরদের শত্রুতা থেকে বাঁচা ও নও-মুসলিমদের আকীদা পোক্ত করার জন্য এ সকল পন্থা অবলম্বনের প্রয়োজন তিরোহিত হয়ে যায়, তখন সেই কারণ ও উদ্দেশ্যও আর বাকি থাকেনি। তাই তাদের সদ্‌কা দানও বন্ধ করে দেয়া হয়। কতিপয় ফিকাহ্‌শাস্ত্রবিদ এ অবস্থার প্রেক্ষিতে হুকুমটি রহিত বলে মন্তব্য করেন। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন হযরত উমর ফারূক (রা), হযরত হাসান বসরী, শা'বী, ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মালেক বিন আনাস (রা)।

তবে অপরাপর ইমাম ও ফিকাহশাস্ত্রবিদদের মতে হুকুমটি রহিত নয়। বরং হযরত আবূ বকর সিদ্দীক ও উমর ফারূক (রা)-এর যুগে প্রয়োজন ছিল না বলে তা বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল। কিন্তু ভবিষ্যতে পুনরায় প্রয়োজন দেখা দিলে এই শ্রেণীর লোকদের যাকাতের অংশ দেয়া যাবে। এ মতের অনুসারী হলেন ইমাম যুহরী, কাযী আবদুল ওহাব ইবনে আরাবী, ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রা)।

প্রকৃত সত্য হল এই যে, কোন যুগেই সদকা প্রভৃতি থেকে অমুসলিমদের অংশ দেয়া হয়নি এবং তারা যাকাতের চতুর্থ ব্যয়খাত 'মুআল্লা-ফাতুলকুলুবে' শামিল ছিল না।

ইমাম কুরতুবী (র) স্বীয় তফসীর গ্রন্থে রসূলে করীম (সা) যাদের চিত্তাকর্ষণের জন্য সদ্‌কার খাত থেকে দান করেছিলেন, সবিস্তারে তাদের নামধামসহ উল্লেখ করে বলেছেন ঃ وبالجملة فكلهم مؤمن ولم يكن فيهم كافر অর্থাৎ তারাই ছিল মুসলমান, তাদের মধ্যে অমুসলমান বলতে কেউ ছিল না।

অনুরূপ তফসীরে মাযহারীতে আছে ঃ

لم يثبت ان النبى صلى الله عليه وسلم اعطى احدا من الكفار للايلاف شيئا من الزكوة অর্থাৎ কোন রেওয়ায়েত থেকে একথা প্রমাণিত নেই যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) কোন কাফিরের চিত্তাকর্ষণের জন্য যাকাতের অংশ দিয়েছিলেন। এ কথার সমর্থনে তফসীরে কাশ্‌শাফের একটি উক্তি পেশ করা যায়। তাতে উল্লেখ আছে যে, "কোরআন এ স্থানে যাকাতের ব্যয়খাতের বর্ণনার উদ্দেশ্য হল কাফির-মুনাফিকদের অপবাদ খণ্ডন করা যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) সদকার অংশ থেকে তাদের বঞ্চিত করেছেন। আয়াতে এই ব্যয়-খাতসমূহের বিবরণ দিয়ে জানিয়ে দেয়া হচ্ছে যে, সদকায় কাফিরদের কোন অধিকার নেই। মুআল্লাফাতুল কুলুবে কাফিররা শামিল থাকলে একথা বলার প্রয়োজন ছিল না।

তফসীরে মাযহারীতে সে ভ্রমটিকেও অত্যন্ত সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা করে দেয়া হয়েছে, যা কোন কোন হাদীসের রেওয়ায়েতের দরুন মানুষের মনে সৃষ্টি হয়েছে। সেসব রেওয়া-য়েতের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) কোন কোন অমুসলিমকে কিছু উপঢৌকন দিয়েছেন। সুতরাং সহীহ মুসলিম ও তিরমিযীর রেওয়ায়েতে সে কথার উল্লেখ রয়েছে

যে, মহানবী (সা) সফওয়ান ইবনে উমাইয়্যাকে তার কাফির থাকাকালে কিছু উপ-ঢৌকন দান করেছেন। সে সম্পর্কে ইমাম নবভী (র)-র উদ্ধৃতিক্রমে লেখা হয়েছে যে, এসব দান যাকাতের মালের মধ্য থেকে ছিল না, বরং হুনাইন যুদ্ধের গনীমতের মালের যে পঞ্চমাংশ বায়তুলমালের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল, তার মধ্য থেকেই দেয়া হয়েছিল। আর এ কথা বলাই বাহুল্য যে, বায়তুলমালের এই খাত থেকে মুসলিম অমুসলিম উভয়ের জন্য ব্যয় করা সমস্ত ফেকাহবিদের ঐকমত্যেই জায়েয। অতপর বলা হয়েছে, ইমাম বায়হাকী (র), ইবনে সাইয়্যেদুন্নাস, ইমাম ইবনে কাসীর প্রমুখ একথাই বলেছেন যে, এ দান যাকাতের মাল থেকে ছিল না, বরং গনীমতের পঞ্চমাংশ থেকে ছিল।

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ এতে বোঝা গেল যে, স্বয়ং রসূলে মকবুল (সা)-এর পবিত্র যুগে সদকার মালামাল যদিও বায়তুলমালে জমা করা হত, কিন্তু তার হিসাব সম্পূর্ণভাবে পৃথক ছিল এবং বায়তুলমালের অন্যান্য খাত—যেমন গনীমতের পঞ্চমাংশ প্রভৃতির হিসাব ছিল আলাদা। তেমনি প্রত্যেক খাতের ব্যয়ক্ষেত্রও ছিল আলাদা। যেমন ফিকাহ-বিদরা বিষয়টি বিশ্লেষণ করেছেন যে, ইসলামী রাষ্ট্রের বায়তুলমালে পৃথক পৃথক চারটি খাত থাকা আবশ্যক। এর প্রকৃত হুকুম হচ্ছে এই যে, শুধু চারটি খাত পৃথক রাখলেই চলবে না বরং প্রতিটি খাতের জন্য বায়তুলমালও পৃথক থাকতে হবে, যাতে প্রতিটি খাত তার নির্ধারিত ব্যয় করার পুরোপুরি সতর্কতা বজায় থাকতে পারে। অবশ্য যদি কোন সময় কোন বিশেষ খাতে কমতি দেখা দেয়, তবে অন্য খাত থেকে ঋণ হিসেবে নিয়ে ব্যয় করা যেতে পারে। বায়তুলমালের এই খাতগুলো নিম্নরূপ ঃ

এক ঃ গনীমতসমূহের পঞ্চমাংশ। অর্থাৎ যে সব মালামাল কাফিরদের থেকে যুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত হয়, তার চার ভাগ মুজাহেদীনের মাঝে বন্টন করে দিয়ে অবশিষ্ট পঞ্চমাংশ যা থাকে তা বায়তুলমালের প্রাপ্য। এবং খনিজ দ্রব্যসমূহের পঞ্চমাংশ। অর্থাৎ বিভিন্ন প্রকার খনি থেকে নির্গত বস্তু-সামগ্রীর এক-পঞ্চমাংশ বায়তুলমালের প্রাপ্য। রেকাযের পঞ্চমাংশ। অর্থাৎ যে প্রাচীন গুপ্তধন কোন যমীন থেকে বের হয়, তারও পঞ্চমাংশ বায়তুলমালের হক। এ তিন প্রকার অর্থসম্পদের পঞ্চমাংশ বায়তুল-মালের একই খাতের অন্তর্ভুক্ত।

দ্বিতীয় খাত হল সদকার খাত—যাতে মুসলমানদের যাকাত সদকায়ে ফিতর ও যমীনের ওশর অন্তর্ভুক্ত।

তৃতীয় খাত 'খেরাজ ও ফাই'-এর মালামালের জন্য। এতে অমুসলমানদের যমীন থেকে লব্ধ কর, তাদের জিযিয়া এবং তাদের কাছ থেকে প্রাপ্ত বাণিজ্যিক ট্যাক্স এবং সে সমস্ত মালামাল যা অমুসলমানদের নিকট থেকে তাদের সম্মতিক্রমে সমঝোতার ভিত্তিতে অর্জিত হয়।

চতুর্থ খাত হল ফৌতী মালের জন্য। যাতে লা-ওয়ারিস মাল, লা-ওয়ারিস ব্যক্তির মীরাস প্রভৃতি অন্তর্ভুক্ত। এই চার প্রকার খাতের ব্যয়ক্ষেত্র যদিও পৃথক পৃথক, কিন্তু এই চার খাতেই ফকীর-মিসকীনদের হক সংরক্ষিত করা হয়েছে। এতে অনুমান করা

যায় যে, ইসলামী রাষ্ট্রে এই দুর্বল শ্রেণীকে সবল করে তোলার প্রতি কতটা গুরুত্ব দেয়া হয়েছে, যা প্রকৃতপক্ষেই ইসলামী শাসনের স্বাতন্ত্র্যের পরিচায়ক। অন্যথায় পৃথিবীর যাবতীয় ব্যবস্থায় একটা বিশেষ শ্রেণীই বড় হতে থাকে; গরীবরা বড় হবার কোন সুযোগই পায় না। ফলে এরই প্রতিক্রিয়া সমাজতন্ত্র ও কম্যুনিজমের জন্ম দিয়েছে। অথচ সেগুলো একান্তই একটি অপ্রাকৃতিক ও অস্বাভাবিক ব্যবস্থা এবং বৃষ্টি থেকে আত্মরক্ষার জন্য ঝর্ণার নিচে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকার মত এবং মানব চরিত্রের জন্য হলাহলস্বরূপ।

সারকথা এই যে, ইসলামী সরকারের চারটি বায়তুলমাল চারটি খাতের জন্য পৃথক পৃথকভাবে নির্ধারিত রয়েছে এবং চারটিতে ফকীর-মিসকীনদের হক সংরক্ষণ করা হয়েছে। এগুলোর মধ্যে প্রথম তিনটি খাতের ব্যয়ক্ষেত্র স্বয়ং কোরআনে করীমই নির্ধারণ করে অতি পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করে দিয়েছে। প্রথম খাত অর্থাৎ গনীমতের মালামালের এক-পঞ্চমাংশের ব্যয়ক্ষেত্র সম্পর্কিত বিবরণ সূরা আন্‌ফালে দশম পারার শুরুতে উল্লেখ রয়েছে। দ্বিতীয় খাতের অর্থাৎ সদ্‌কা-খয়রাতের ব্যয় ক্ষেত্রের বিবরণ সূরা তওবার আলোচ্য ষষ্ঠতম আয়াতে এসেছে। এখানে তারই বিস্তারিত ব্যাখ্যা করা হচ্ছে। আর তৃতীয় খাতকে পরিভাষাগতভাবে 'মালে-ফাই' বলে অভিহিত করা হয়। এর বিবরণ সূরা হাশরে বিস্তারিতভাবে এসেছে। ইসলামী সরকারের অধিকাংশ ব্যয়, সামরিক ব্যয় ও সরকারী কর্মচারীদের বেতন-ভাতা প্রভৃতি এ খাত থেকেই নির্বাহ করা হয়। চতুর্থ খাত, অর্থাৎ লা-ওয়ারিস মালামাল রসূলে করীম (সা)-এর নির্দেশ ও খুলাফায়ে রাশেদীনের কর্মপন্থা অনুযায়ী অভাবী, পঙ্গু ও লা-ওয়ারিস শিশুদের জন্য নির্ধারিত।——(শামী-কিতাবুয্ যাকাত)

সারকথা এই যে, ফিকাহ্‌শাস্ত্রবিদরা বায়তুলমালের চারটি খাতকে পৃথক পৃথকভাবে সংরক্ষণ করার এবং তার নির্ধারিত ক্ষেত্র অনুযায়ী ব্যয় করার নির্দেশ দিয়েছেন। কোরআনের এসব বাণীও রসূলে করীম (সা) এবং খুলাফায়ে রাশেদীনের কর্মপন্থার দ্বারাও সুস্পষ্টভাবে তাই প্রমাণিত হয়।

প্রাসঙ্গিক এই আলোচনার পর মূল বিষয়——مؤلفة القلوب—এর মাস'আলাটি লক্ষ্য করুন। উল্লিখিত বর্ণনায় বিজ্ঞ মুহাদ্দিসীন ও ফিকাহ্‌বিদদের ব্যাখ্যায় একথা প্রমাণিত হয়ে গেছে যে, مؤلفة القلوب-এর কোন অংশ কোন কাফিরকে কখনও দেয়া হয়নি। না রসূলে করীম (সা)-এর আমলে এবং না খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগে। আর যে সমস্ত অমুসলমানকে দেয়ার বিষয় প্রমাণিত রয়েছে, তা সদ্‌কা-যাকাতের খাত থেকে দেয়া হয়নি; বরং গনীমতের পঞ্চমাংশ থেকে দেয়া হয়েছে, যা মুসলমান-অমুসলমান নির্বিশেষে যে কোন হাজতমন্দকেই দেয়া যেতে পারে। কাজেই مؤلفة القلوب বলতে থাকে শুধুমাত্র মুসলমান। বস্তুত এদের মাঝে যারা ফকীর তাদের অংশ যথাপূর্ব থাকার ব্যাপারে সমগ্র উম্মতের ঐকমত্য রয়েছে। মতবিরোধ শুধু এ অবস্থার ক্ষেত্রে রয়ে গেছে যে, এরা যদি সাহেবে-নিসাব, ধনীও হয় তবু ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ

(র)-এর মতে যেহেতু যাকাতের সমস্ত ব্যয়ক্ষেত্রেই ফকীর হওয়া শর্ত নয়, তাই তাঁরা مؤلفة القلوب এ এমন ধরনের লোকদেরকেও অন্তর্ভুক্ত করেন, যারা ধনী ও সাহেবে-নিসাব। ইমাম আ'যম আবূ হানীফা ও ইমাম মালেক (র)-এর মতে সদকা উসুলকারী 'আমিলীন'দের ছাড়া বাকি সমস্ত ব্যয়ক্ষেত্রে গরীব ও অসহায়ত্ব যেহেতু শর্ত, কাজেই مؤلفة القلوب -এর অংশও তাদেরকে এ শর্ত-সাপেক্ষেই দেয়া হবে যে, তারা ফকীর ও হাজতমন্দ হবে। যেমন, ابن السبيل ও رقاب غارمين প্রভৃতিকে এ শর্তেই যাকাত দেয়া হয় যে, এরা হাজতমন্দ ; অভাবী। তা নিজেদের এলাকায় এরা মালদার, ধনীও হতে পারে।

এ ব্যাখ্যায় দেখা যায়, চার ইমামের মধ্যে কারো মতেই مؤلفة القلوب -এর অংশ বাতিল হয়ে যায় না, তবে পার্থক্য হল শুধু এতটুকু যে, কেউ ফকীর-মিসকীন ব্যতীত অন্য কোন ব্যয়ক্ষেত্রে দৈন্য ও অভাবগ্রস্ততার শর্ত আরোপ করেন নি, আর কেউ এই শর্ত আরোপ করেছেন। যারা এই শর্ত আরোপ করেছেন, তাঁরা مؤلفة القلوب -এর মধ্যেও শুধুমাত্র সেই সব লোককেই অংশ দান করেন যারা গরীব ও অভাবগ্রস্ত। যা হোক, এ অংশ যথাযথ বিদ্যমান রয়েছে।—(তফসীরে-মাযহারী)

এ পর্যন্ত সদ্‌কার আটটি ব্যয়ক্ষেত্রের চারটির বিবরণ দান করা হল। এ চারটির অধিকার 'লাম' বর্ণের আওতায় বর্ণনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِيْنِ পরবর্তীতে যে চারটি ব্যয়খাতের আলোচনা করা হয়েছে, সেগুলোর মধ্যে শিরোনাম পরিবর্তন করে 'লাম'-এর পরিবর্তে فِىْ (ফী) ব্যবহার করা হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ وَفِى الرِّقَابِ - وَالْغَارِمِيْنَ - ইমাম যামাখ্‌শারী তাঁর 'কাশ্‌শাফ' গ্রন্থে এর কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন যে, এতে এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা উদ্দেশ্য যে, শেষের এ চারটি ব্যয়খাত প্রথম চারটি ব্যয়খাতের তুলনায় বেশি হকদার। কারণ ; فِىْ হরফটি পাত্রকে বোঝাবার জন্য বলা হয়। ফলে তার অর্থ দাঁড়ায় এই যে, সদ্‌কাসমূহ সেসব লোকের মাঝে রেখে দেয়া উচিত। তাদের অধিকতর হকদার হওয়ার কারণ এই যে, প্রয়োজনীয়তা তাদেরই বেশি। কেননা, যে লোক কারো মালিকানাধীন দাসত্বের শৃংখলে আবদ্ধ, সে সাধারণ ফকীর-মিসকীনদের তুলনায় বেশি কষ্টে রয়েছে। তেমনিভাবে যে লোক কারো কাছে ঋণী এবং পাওনাদাররা তার উপর থাকে, সে সাধারণ গরীব-মিসকীনের চেয়ে বেশি অভাবে থাকে। কারণ, নিজের দৈনন্দিন ব্যয়ভারের চাইতেও বেশি চিন্তা থাকে তার পাওনাদারদের জন্যে।

বাকি এই চারটি ব্যয়খাতের মধ্যে সর্বপ্রথম وَفِى الرِّقَابِ উল্লেখ করা হয়েছে। رِقَاب হল رَقَبَةٌ-এর বহুবচন। প্রকৃতপক্ষে رَقَبَةٌ বলা হয় গর্দান, গ্রীবা তথা ঘাড়কে। আর প্রচলিত অর্থে এমন লোককে رَقَبَةٌ বলা হয় যার গর্দান অন্য কারো গোলামিতে আবদ্ধ থাকে।

এতে ফিকাহ্‌বিদদের মতবিরোধ রয়েছে যে, এ আয়াতে رِقَاب--এর মর্ম কি? অধিকাংশ ফিকাহ্‌বিদ ও হাদীসবিদের মতে এর মর্ম এমন গোলাম বা ক্রীতদাস যাদের মনিব কোন সম্পদ বা অর্থের পরিমাণ নির্ধারণ করে বলে দিয়েছে যে, এ পরিমাণ অর্থ বা সম্পদ রোজগার করে দিয়ে দিলে তুমি আযাদ বা মুক্ত। একে কোরআন ও সুন্নাহ্‌র পরিভাষায় 'মুকাতাব' বলা হয়। এমন লোককে মনিব এ অনুমতি দিয়ে দেয় যে, সে ব্যবসা-বাণিজ্য কিংবা শ্রমের মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করবে এবং তা মনিবকে এনে দেবে। উল্লিখিত আয়াতে رِقَاب--এর মর্ম এই যে, সে লোককে যাকাতের অর্থ থেকে অংশ বিশেষ দিয়ে তার মুক্তি লাভে যেন সাহায্য করা হয়।

وَفِى الرِّقَابِ বলতে যে এ ধরনের গোলাম বা ক্রীতদাসকেই বোঝানো হয়েছে, সে ব্যাপারে তফসীরবিদ ও ফিকাহ্‌বিদ ইমামের া একমত যে, তাদেরকে যাকাতের অর্থ দান করে তাদের মুক্তিলাভে সাহায্য করা উচিত। এদের ছাড়া অন্য গোলামদের খরিদ করে মুক্তি দান কিংবা তাদের মনিবদের যাকাতের অর্থ দিয়ে এমন চুক্তি সম্পাদন করা যাতে তারা এদের মুক্ত করে দেয়---এ ব্যাপারে ফিকাহ্‌বিদদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। অধিকাংশ ইমাম---ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র) প্রমুখ একে জায়েয মনে করেন না। আর হযরত ইমাম মালেক (র)-এর এক রিওয়ায়েতও অধিকাংশ ইমামদেরই সাথে রয়েছে। অর্থাৎ فِى الرِّقَاب-কে শুধুমাত্র মুকাতাব গোলামদের সাথে নির্দিষ্ট করেছেন। অপর এক রেওয়ায়েত মতে ইমাম মালেক (র) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, তিনি فِى الرِّقَاب--এ সাধারণ গোলামদের অন্তর্ভুক্ত করে এ অনুমতিও দিয়েছেন যে, যাকাতের অর্থের দ্বারা গোলামকে খরিদ করে নিয়ে মুক্ত করা যেতে পারে।---(আহ্‌কামুল কোরআন, ইবনে আরাবী মালেকী)

অধিকাংশ ইমাম ও ফিকাহ্‌বিদ যারা একে জায়েয বলেন না, তাঁদের সামনে একটি ফিকাহ্ সংক্রান্ত আপত্তি রয়েছে যে, যাকাতের অর্থে যদি গোলাম খরিদ করে মুক্ত করা হয়, তাহলে এর উপর সদ্‌কার সংজ্ঞাই প্রযোজ্য হয় না। কারণ, যাকাত সে অর্থ-সম্পদকে বলা হয় যা কোন রকম বিনিময় ব্যতিরেকে দান করা হয়। সুতরাং যাকাতের অর্থ যদি মনিবকে দেয়া হয়, তবে বলাই বাহুল্য যে, সে না যাকাত পাবার যোগ্য এবং না তাকে এ অর্থ বিনিময় ব্যতীত দেয়া হচ্ছে। বস্তুত গোলাম যে, এ অর্থ পাবার যোগ্য, তাকে দেয়া হয়নি। অবশ্য এ কথা আলাদা যে, এ অর্থ দেয়ার উপকারিতা গোলাম

পেয়ে গেছে—কেননা দাতা তাকে খরিদ করে মুক্ত করে দিয়েছে। কিন্তু মুক্ত করা সদ্‌কার সংজ্ঞায় অন্তর্ভুক্ত হয় না এবং অকারণে প্রকৃত অর্থকে পরিহার করে সদ্‌কার রূপক অর্থ অর্থাৎ সাধারণ মর্ম গ্রহণ করা বিনা প্রয়োজনে জায়েয হবার কোন কারণ নেই। আর একথাও পরিষ্কার যে, উল্লিখিত আয়াতে সদ্‌কারই ব্যয়খাতসমূহ বর্ণনা করা হচ্ছে। কাজেই فى الرقاب-এর মর্ম এমন কোন বস্তু হতেই পারে না, যার উপর সদ্‌কার সংজ্ঞা প্রযোজ্য হয় না। যাকাতের এ অর্থ যদি গোলামকে দেয়া হয়, তবে যেহেতু গোলামের ব্যক্তিগত কোন মালিকানা অধিকার নেই, কাজেই তা আপনা-আপনিই মনিবের সম্পদ হয়ে যাবে। তখনও আযাদ করা না করা তারই ইখতিয়ারে থাকবে।

এই ফিকাহ্ সংক্রান্ত আপত্তির কারণে অধিকাংশ ইমাম ও ফিকাহ্‌বিদ বলেছেন যে,—فى الرقاب--এর দ্বারা শুধুমাত্র 'মুকাতাব' গোলামকে বোঝানোই উদ্দেশ্য। এতে এ কথাও বোঝা গেল যে, সদ্‌কা আদায় হওয়ার জন্য পাওয়ার যোগ্য কাউকে সে সম্পদের মালিক বানিয়ে দিতে হবে। যতক্ষণ তাতে তার মালিকানাসুলভ অধিকার প্রতিষ্ঠিত না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত যাকাত আদায় হবে না।

ষষ্ঠ ব্যয়খাত হল اَلْغَارِمِيْنَ যা غَارِمٌ-এর বহুবচন। এর অর্থ দেনাদার, ঋণী। এ কথা পূর্বেই বলা হয়েছে যে, পঞ্চম ও ষষ্ঠ ব্যয়খাত যা فى--এর সহযোগে বর্ণনা করা হয়েছে, তা প্রাপ্যতার অধিকারে প্রথম চারটি ব্যয়খাত অপেক্ষা অগ্রগণ্য। সেজন্য গোলামকে তার মুক্তির জন্য কিংবা ঋণগ্রস্তকে তার ঋণ মুক্তির জন্য দান করা সাধারণ ফকীর-মিসকীনকে দান করার চাইতে উত্তম। তবে শর্ত হচ্ছে এই যে, সে ঋণগ্রস্তের কাছে এ পরিমাণ সম্পদ থাকবে না, যাতে সে ঋণ পরিশোধ করতে পারে। কারণ, অভিধানে এমন ঋণী ব্যক্তিকেই غارم (গারেম) বলা হয়। আবার কোন কোন ইমাম এ শর্তও আরোপ করেছেন যে, সে ঋণ যেন কোন অবৈধ কাজের জন্য না করে থাকে। কোন পাপ কাজের জন্য যদি ঋণ করে থাকে—যেমন, মদ কিংবা বিয়ে-শাদীর নাজায়েয প্রথা-অনুষ্ঠান প্রভৃতি, তবে এমন ঋণগ্রস্তকে যাকাতের অর্থ থেকে দান করা যাবে না, যাতে তার পাপ কাজ ও অপব্যয়ে অনর্থক উৎসাহ দান করা হয়।

সপ্তম খাত فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ এখানে আবারো فى হরফের পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। তফসীরে-কাশ্‌শাফে বর্ণিত রয়েছে যে, এই পুনরাবৃত্তিতে ইঙ্গিত করা উদ্দেশ্য যে, এ খাতটি পূর্বোল্লিখিত সব খাত অপেক্ষা উত্তম। তার কারণ এই যে, এতে দু'টি ফায়দা রয়েছে। (১) গরীব-নিঃস্বের সাহায্য এবং (২) একটি ধর্মীয় সেবায় সহায়তা করা। কারণ في سبيل الله -এর মর্ম সেসব গাযী ও মুজাহিদ যাদের অস্ত্র ও জিহাদের

উপকরণ ক্রয় করার ক্ষমতা নেই অথবা ঐ ব্যক্তি যার উপর হজ্জ করা ফরয হয়ে গেছে, কিন্তু এখন আর তার কাছে এমন অর্থ নেই যাতে সে ফরয হজ্জ আদায় করতে পারে। এ দু'টি কাজই নির্ভেজাল ধর্মীয় খিদমত ও ইবাদত। কাজেই যাকাতের মাল এতে ব্যয় করায় একজন নিঃস্ব লোকের সাহায্য হয় এবং একটি ইবাদত আদায়ের সহযোগিতাও হয়। এমনিভাবে ফিকাহ্‌বিদগণ ছাত্রদেরকেও এর অন্তর্ভুক্ত করেছেন। কারণ, তারাও একটি ইবাদত আদায় করার জন্যই এ ব্রত গ্রহণ করে থাকে।---(যাহেরিয়ার হাওয়ালায় রূহুল মা'আনী)

বাদায়ে' প্রণেতা বলেছেন যে, এমন প্রত্যেক লোকই 'ফী-সাবীলিল্লাহ' খাতের আওতাভুক্ত, যে কোন সৎকাজ কিংবা ইবাদত করতে চায় যাতে অর্থের প্রয়োজন। অবশ্য এতে শর্ত এই যে, তার কাছে এমন অর্থ-সম্পদ থাকবে না, যদ্দ্বারা সে কাজ সম্পাদন করতে পারে। যেমন, ধর্মীয় শিক্ষা ও তবলীগ এবং সে জন্য প্রচার-প্রকাশনা প্রভৃতি। কোন যাকাতের হকদার লোক যদি এ কাজ করতে চায়, তবে তাকে যাকাতের মাল দিয়ে সাহায্য করা যেতে পারে, কিন্তু কোন মালদার লোককে তা দেয়া যায় না।

উল্লিখিত বিশ্লেষণে বোঝা যায় যে, এ সমস্ত অবস্থাতেই যা فِى سَبِيْلِ اللهِ--এর তফসীরে বর্ণনা করা হলো, দারিদ্র্য ও অভাবগ্রস্ততার শর্তটির প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে। কোন ধনী সাহেবে নিসাবের কোন অংশ এতে নেই। অবশ্য যদি তার বর্তমান মালামাল তার সে প্রয়োজন মেটাতে না পারে, যা জিহাদ কিংবা হজ্জের জন্য প্রয়োজন, তবে যদিও নিসাব পরিমাণ মালামাল বর্তমান থাকার কারণে তাকে ধনী বলা যেতে পারে---যেমন এক হাদীসেও তাকে غنى (ধনী) বলা হয়েছে, কিন্তু সেও এ হিসাবে ফকীর ও অভাবগ্রস্ত বলে গণ্য হবে। যে পরিমাণ অর্থ-সম্পদ জিহাদ অথবা হজ্জের জন্য প্রয়োজন তা তার কাছে বর্তমান নয়। 'ফতহুল-কাদীর' গ্রন্থে শায়খ ইবনে হুমাম (র) বলেছেন, সদ্‌কাসংক্রান্ত আয়াতসমূহে যেসব ব্যয়খাতের কথা বলা হয়েছে তার প্রত্যেকটির শব্দ স্বয়ং এর প্রমাণ বহন করে যে, সে তার দৈন্য ও অভাবের ভিত্তিতেই হকদার। ফকীর ও মিসকীন শব্দে তো তা সুস্পষ্ট রয়েছে; রেকাব, গারেমীন, ফী-সাবীলিল্লাহ, ইবনুস সাবীল প্রভৃতি শব্দও এরই ইঙ্গিতবহ যে, তাদের অভাব দূর করার ভিত্তিতেই তাদেরকে দান করা হয়। অবশ্য যারা عاملين (আমেলীন) যাকাত উসুলকারী---তাদেরকে দেয়া হয় তাদের সেবার বিনিময়ে। সুতরাং এতে আমীর-ফকীর সমান। যেমন, غارمين -এর খাত সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে যে, যে লোকের উপর দশ হাজার টাকার ঋণ রয়েছে এবং পাঁচ হাজার টাকা তার কাছে রয়েছে, তাকে পাঁচ হাজার টাকার যাকাত দেয়া যেতে পারে। কারণ, যে মাল তার কাছে মওজুদ রয়েছে, তা তার ঋণের দরুন না থাকারই শামিল।

জ্ঞাতব্য ঃ فى سبيل الله শব্দের শাব্দিক অর্থ অতি ব্যাপক। যেসব কাজ আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে করা হয়, সে সবই এই ব্যাপক মর্মানুযায়ী فى سبيل الله -এর অন্তর্ভুক্ত। যেসব লোক রসূলে করীম (সা)-এর ব্যাখ্যা ও বর্ণনা এবং তফসীরশাস্ত্রের ইমামদের বক্তব্য থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে শুধুমাত্র শাব্দিক অর্থের মাধ্যমে কোরআনকে বোঝাতে চায়, এখানে তাদের এ বিভ্রান্তির সম্মুখীন হতে হয়েছে যে, তারা فى سبيل الله- শব্দটি দেখেই সে সমস্ত কাজকেও যাকাতের ব্যয় খাতের অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছে, যা কোন কোন দিক দিয়ে সৎকাজ কিংবা ইবাদত বলে গণ্য। মসজিদ, মাদ্রাসা, হাসপাতাল, সরাইখানা প্রভৃতি নির্মাণ, কূপ খনন, পুল ও সড়ক তৈরী করা এবং সেসব জনকল্যাণমূলক সংস্থার কর্মচারীদের বেতন ও যাবতীয় ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনীয়তাকে তাঁরা فى سبيل الله -এর অন্তর্ভুক্ত করে নিয়ে যাকাতের ব্যয়খাত সাব্যস্ত করে দিয়েছেন, যা একান্তই ভুল এবং সমগ্র উম্মতের ইজমার পরিপন্থী। সাহাবায়ে কিরাম, যাঁরা কোরআনকে সরাসরি রসূলে করীম (সা)-এর কাছে অধ্যয়ন করেছেন ও বুঝেছেন, তাঁদের এবং তাবেয়ীন ইমামগণের যত রকম তফসীর এ শব্দটির ব্যাপারে উদ্ধৃত রয়েছে তাতে এ শব্দটিকে হজ্জব্রতী ও মুজাহিদীনের জন্য নির্দিষ্ট বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে।

এক হাদীসে বর্ণিত রয়েছে যে, এক ব্যক্তি তাঁর একটি উট (ফী-সাবীলিল্লাহ্) ওয়াকফ করে দিয়েছিল। তখন মহানবী (সা) সে লোকটিকে বলে দেন যে, একে হাজীদের সফরের কাজে ব্যবহার করো।—(মবসূত ৩, পৃঃ—১০)

ইমাম ইবনে জরীর ইবনে কাসীর প্রমুখ হাদীসের রেওয়ায়েতের দ্বারাই কোরআনের তফসীর করেন। তাঁদের সবাই فى سبيل الله- শব্দকে এমন মুজাহিদীন ও হজ্জব্রতীদের জন্য নির্দিষ্ট করেছেন, যাদের কাছে জিহাদ কিংবা হজ্জ করার উপকরণ নেই। আর যেসব ফিকাহ্‌বিদ মনীষী তালেবে-ইলম কিংবা অন্যান্য সৎকর্মীকে এর অন্তর্ভুক্ত করেছেন, তাঁরাও এ শর্তেই তা করেছেন যে, তাদেরকে ফকীর ও অভাবগ্রস্ত হতে হবে।' আর একথা বলাই বাহুল্য যে, ফকীর অভাবগ্রস্তরা নিজেই যাকাতের সর্বপ্রথম ব্যয়খাত। এদেরকে ফী-সাবীলিল্লাহ্‌র অন্তর্ভুক্ত করা না হলেও এরা যাকাতের হকদার ছিল। কিন্তু চার ইমাম ও উম্মতের ফিকাহ্‌বিদদের কেউই একথা বলেন নি যে, জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান ও মসজিদ-মাদ্রাসা নির্মাণে এবং সে সমস্তের যাবতীয় প্রয়োজন যাকাতের ব্যয়খাতের অন্তর্ভুক্ত। বরং তাঁরা এর বিরুদ্ধে বক্তব্য রেখে বলেছেন যে, যাকাতের মালামাল এসব বিষয়ে ব্যয় করা না-জায়েয। হানাফী ফিকাহ্‌বিদ ইমামদের মধ্যে শামসুল আয়েম্মা সারাখ্‌সী মবসূত দ্বিতীয় খণ্ড, ২০২ পৃষ্ঠায় এবং শরহেসিয়ার চতুর্থ খণ্ড, ২৪৪ পৃষ্ঠায় শাফেয়ী ফিকাহ্‌বিদদের মধ্যে আবূ ওবায়েদ 'কিতাবুল-আমওয়াল' গ্রন্থে, মালেকী ফিকাহ্‌বিদদের 'দার্দেজ শরহে মুখতাসারুল খলীল' প্রথম খণ্ড, ১৬১ পৃষ্ঠায় এবং হাম্বলী ফিকাহ্‌বিদদের মধ্যে 'মুত্তাফিক মুগনী' গ্রন্থে এ বিষয়টি সবিস্তারে লিখেছেন।

তফসীরশাস্ত্রের ইমাম ও ফিকাহ্‌বিদদের উল্লিখিত এই বিশ্লেষণ ছাড়াও যদি একটি বিষয় লক্ষ্য করা যায়, তবে এ বিষয়টি বোঝার জন্য যথেস্ট। তাহল এই যে, যাকাতের মাস'আলার ক্ষেত্রে যদি এতই ব্যাপকতা থাকত যে, সমস্ত ইবাদত-উপাসনা ও যাবতীয় সৎকাজে ব্যয় করাই এর অন্তর্ভুক্ত, তাহলে আর কোরআনে এই আটটি খাতের আলোচনা (নাউযুবিল্লাহ) একেবারেই বেকার হয়ে যেত। তাছাড়া এ ব্যাপারে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সে বাণীই যথেস্ট যাতে ইতিপূর্বে বলা হয়েছে যে, তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা সদ্কার ব্যয়খাত নির্ধারণের বিষয়টি নবীগণকে সমর্পণ করেননি ; বরং তিনি নিজেই এর আটটি খাত নির্দিস্ট করে দিয়েছেন।

অতএব, সমস্ত ইবাদত-উপাসনা ও সৎকর্মই যদি فى سبيل الله -এর মর্ম-ভুক্ত হতো এবং এর যে কোনটিতে যাকাতের মালামাল ব্যয় করা যেত, তবে (নাউযু-বিল্লাহ্) নবী (সা)-র বাণীও সম্পূর্ণভাবে ভুল প্রতিপন্ন হয়ে যেত। কাজেই বোঝা যাচ্ছে فى سبيل الله -এর আভিধানিক অর্থ দেখেই অজ্ঞজনের নিকট যে ব্যাপক বলে মনে হয় তা কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলার উদ্দেশ্য নয়। বরং প্রকৃত মর্ম হল তাই, যা রসূলে করীম (সা), সাহাবায়ে কিরাম ও তাবেয়ীন (র) গণের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে প্রমাণিত।

অস্টম খাত হল ابن السبيل (ইবনুস সাবীল)। سبيل অর্থ পথ। আর ابن অর্থ মূলত পুত্র হলেও আরবী পরিভাষায় ابن ، اب ، ও أخ প্রভৃতি সেসমস্ত বিষয়ের জন্যও বলা হয়, যার গভীর ও নিবিড় সম্পর্ক কারো সাথে থাকে। এই পরিভাষা অনুযায়ীই ابن السبيل বলা হয় পথিক ও মুসাফিরকে। কারণ, পথ অতিক্রম করা এবং গন্তব্য স্থানের সন্ধান করার সাথে তাদের সম্পর্কও অতি নিবিড়। আর যাকাতের ব্যয়খাতের ক্ষেত্রে এমন মুসাফির বা পথিককে বোঝানোই উদ্দেশ্য, যার কাছে সফরকালে প্রয়োজনীয় অর্থ-সম্পদ নেই, স্বদেশে তার যত অর্থ-সম্পদই থাক না কেন! এমন মুসাফিরকে যাকাতের মাল দেয়া যেতে পারে যাতে করে সে তার সফরের প্রয়োজনাদি সমাধা করতে পারবে এবং স্বদেশে ফিরে যেতে সমর্থ হবে।

এ পর্যন্ত যাকাতের সে আটটি খাতের বিবরণ সমাপ্ত হল, যা উল্লিখিত আয়াতে সদ্কা ও যাকাত সম্পর্কে বলা হয়েছে। এবার এমন কিছু মাস'আলা বর্ণনা করা যাচ্ছে যেগুলো একইভাবে সে সমস্ত খাতের সাথে সম্পর্কযুক্ত।

মালিকানা ঃ অধিকাংশ ফিকাহ্‌বিদ এ ব্যাপারে একমত যে, যাকাতের নির্ধারিত আটটি খাতে ব্যয় করার ব্যাপারেও যাকাত আদায় হওয়ার জন্য শর্ত রয়েছে যে, এ সব খাতের কোন হকদারকে যাকাতের মালের উপর মালিকানা স্বত্ব বা অধিকার দিয়ে দিতে হবে। মালিকানা অধিকার দেয়া ছাড়া যদি কোন মাল তাদেরই উপকারকল্পে ব্যয় করা হয়, তবুও যাকাত আদায় হবে না। সে কারণেই চার ইমামসহ উম্মাহ্‌র অধিকাংশ

ফিকাহ্‌বিদ এ ব্যাপারে একমত যে, যাকাতের অর্থ মসজিদ-মাদ্রাসা কিংবা হাসপাতাল-এতীমখানা নির্মাণ অথবা তাদের অন্যান্য প্রয়োজনে ব্যয় করা জায়েয নয়। যদিও এসব বিষয়ের উপকারিতা সেই ফকীর-মিসকীন ও অন্যরা প্রাপ্ত হয়, যারা যাকাতের খাত হিসাবে গণ্য, কিন্তু তাদের মালিকানা-স্বত্ব এসব বিষয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত না হওয়ার দরুন এতে যাকাত আদায় হবে না।

অবশ্য এতীমখানাগুলোতে যদি মালিকানা-স্বত্ব হিসাবে এতীমদের খাওয়া-পরা দেয়া হয়, তবে সে ব্যয়ের অনুপাতে যাকাতের অর্থ ব্যয় করা যেতে পারে। তেমনি-ভাবে হাসপাতালসমূহে যেসব ওষুধ অভাবী গরীবদেরকে মালিকানা অধিকার মুতাবিক দিয়ে দেয়া হয়, তার মূল্যও যাকাতের অর্থে পরিশোধ করা যেতে পারে। এমনিভাবে উম্মাহ্‌র ফিকাহ্‌বিদদের ব্যাখ্যা অনুযায়ী লা-ওয়ারিস মৃতের কাফন যাকাতের অর্থ থেকে দেয়া যেতে পারে না। কারণ, মৃতের মালিক হওয়ার যোগ্যতা থাকে না। তবে যাকাতের অর্থ যদি কোন গরীব হকদার লোককে দিয়ে দেয়া হয় এবং সে স্বেচ্ছায় সে অর্থ লা-ওয়ারিস মৃতের কাফনে ব্যয় করে, তাহলে তা জায়েয। তেমনিভাবে যদি সে মৃতের উপর ঋণ থাকে, তবে সে ঋণ সরাসরি যাকাতের অর্থের দ্বারা আদায় করা যায় না। তবে তার কোন ওয়ারিস যদি গরীব ও যাকাতের হকদার হয়, তবে তাকে মালিকানার ভিত্তিতে তা দেয়া যেতে পারে। তখন সে সে অর্থের মালিক হয়ে নিজের ইচ্ছায় তা দ্বারা মৃতের ঋণ পরিশোধ করতে পারে। এমনিভাবে জনকল্যাণমূলক যাবতীয় কাজকর্ম—যেমন কূপ খনন, পুল নির্মাণ কিংবা সড়ক তৈরি প্রভৃতি—যদিও এসবের মাধ্যমে যাকাত পাবার যোগ্য লোকেরাও উপকৃত হয়, কিন্তু এতে তাদের মালিকানা অধিকার প্রতিষ্ঠিত না হওয়ার দরুন এতে যাকাত আদায় হবে না।

এই মাস'আলার ব্যাপারে চার 'ইমামে-মুজতাহিদীন'—ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম মালিক, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র) এবং মুসলিম ফিকাহ্‌-বিদগণ সবাই একমত। শামসুল আয়িম্মা সারাখ্‌সী এ বিষয়টিকে ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর গ্রন্থরাজির ব্যাখ্যা বা শরাহ্‌ 'মবসূত' ও 'শরহে সিয়ারে' পূর্ণ গবেষণাসহ সবি-স্তারে লিখেছেন এবং শাফেয়ী, মালিকী ও হাম্বলী ফিকাহ্‌বিদগণের সাধারণ কিতাব-সমূহে এর বিশ্লেষণ বিদ্যমান রয়েছে।

শাফেয়ী ফিকাহ্‌বিদ ইমাম আবূ ওবাইদাহ্‌ 'কিতাবুল আমওয়াল' গ্রন্থে বলেছেন যে, মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে তার ঋণ পরিশোধ করা কিংবা তাকে দাফন-কাফন করার ব্যয় বাবদ এবং মসজিদ নির্মাণ ও নহর-খাল খনন প্রভৃতি কাজে যাকাতের মাল ব্যয় করা জায়েয নয়। সুফিয়ান সওরী (র)-সহ সমস্ত ইমাম এ ব্যাপারে একমত যে, এসব বাবদে ব্যয় করাতে যাকাত আদায় হয় না। কেননা, এগুলো সে আটটি খাতের অন্ত-র্ভুক্ত নয়, যার উল্লেখ কোরআনে করীমে এসেছে।

তেমনিভাবে হাম্বলী ফিকাহ্‌বিদ মুওয়াফফিক (র) 'মুগনী' গ্রন্থে লিখেছেন, সেসমস্ত খাত ব্যতীত যা কোরআন করীমে উল্লেখ রয়েছে অন্য কোন সৎকাজেই

যাকাতের মাল ব্যয় করা জায়েয নয়। যেমন মসজিদ, পুল, পানির ব্যবস্থা করা কিংবা সড়ক মেরামত অথবা মৃতের কাফন-দাফন বা মেহমানদের খানা খাওয়ানো প্রভৃতি যা সন্দেহাতীতভাবেই সওয়াবের কাজ বটে, কিন্তু যাকাতের খাতসমূহের অন্তর্ভুক্ত নয়।

মালিকুল-ওলামা তাঁর 'বেদায়া' গ্রন্থে যাকাত আদায় হওয়ার জন্য মালিকানা সাব্যস্ত হওয়ার শর্তের পক্ষে দলীল দিয়েছেন যে, কোরআনে সাধারণত যাকাত ও ওয়াজিব সদ্কার ক্ষেত্রে إِيتَاءُ শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ

أَقِيمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ - أَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ

اٰتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ - إِقَامِ الصَّلٰوةِ وَإِيتَاءِ الزَّكٰوةِ প্রভৃতি

আর إِيتَاءُ শব্দটি অভিধানে দান করা অর্থে ব্যবহৃত হয়। ইমাম রাগিব ইসফাহানী (র) 'মুফরাদাতে কোরআন' গ্রন্থে বলেছেন ঃ — والايتاء الاعطاء وخص وضع الصدقة فى القران بالايتاء অর্থাৎ ঈতা' অর্থ দান করা। আর কোরআনে ওয়াজিব সদ্কা আদায় করাকে ঈতা শব্দের সাথে নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। আর একথা বলাই বাহুল্য যে, কাউকে কোন কিছু দান করার মর্ম এটাই যে, তাকে সে বস্তুর মালিক বানিয়ে দেয়া হবে।

তাছাড়া যাকাত ছাড়াও إِيتَاءُ শব্দটি কোরআন করীমে মালিক বানিয়ে দেওয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন, اٰتُوا النِّسَاءَ صَدُقٰتِهِنَّ অর্থাৎ স্ত্রীদেরকে তাদের মোহরানা দিয়ে দাও। আর একথা সুস্পষ্ট যে, মোহরানা পরিশোধ করা হয়েছে বলে তখনই স্বীকৃত হবে যখন মোহরের অর্থের উপর স্ত্রীর মালিকানা স্বত্ব দিয়ে দেওয়া হবে।

দ্বিতীয়ত, কোরআনে করীমে যাকাতকে 'সদ্কা' শব্দে উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ — إِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَاءِ - আর صدقة (সদকাহ্)-এর প্রকৃত অর্থ তাই যে, কোন ফকীর অভাবগ্রস্তকে তার মালিক বানিয়ে দেয়া হবে।

কাউকে খাবার খাইয়ে দেয়া কিংবা জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করে দেয়াকে প্রকৃত অর্থের দিক দিয়ে 'সদ্কা' বলা হয় না। শায়খ ইবনে হুমাম 'ফাতহুল কাদীর' গ্রন্থে বলেছেন, সদ্কার তাৎপর্যও তাই যে, কোন কাফিরকে সে মালের মালিক বানিয়ে দেওয়া হবে। এমনিভাবে ইমাম জাসসাস 'আহ্কামুল কোরআনে' বলেছেন, 'সদ্কা' শব্দটি হল মালিক করে দেয়ার নাম। (জাসসাস ২য় খঃ, ১৫২ পৃঃ)

যাকাত পরিশোধ সংক্রান্ত কয়েকটি গুরুত্বপর্ণ মাস'আলা ঃ হাদীসে আছে যে, মহানবী (সা) হযরত মুআয (রা)-কে সদ্কা আদায় করার ব্যাপারে এই হিদায়ত

দিয়েছিলেন যে, خذها من اغنيائهم وردها فى فقرائهم অর্থাৎ সদ্‌কা মুসলমানদের ধনী, মালদার লোকদের কাছ থেকে নিয়ে তাদেরই ফকীর-মিসকীনদের মাঝে ব্যয় কর। এ হাদীসের ভিত্তিতে ফিকাহ্‌বিদগণ বলেছেন যে, প্রয়োজন ব্যতীত এক শহর বা জনপদের যাকাত অন্য শহর বা জনপদে যেন পাঠানো না হয়, বরং সে শহর ও জনপদের ফকীর-মিসকীনরাই তার বেশি হকদার। অবশ্য কারো কোন নিকটাত্মীয় যদি গরীব হয় এবং সে অন্য কোন শহর বা জনপদে থাকে, তবে স্বীয় যাকাত তার জন্য পাঠাতে পারে। কারণ, রসূলে করীম (সা) এতে দ্বিগুণ সওয়াবের সুসংবাদ দিয়েছেন।

তেমনিভাবে যদি অন্য কোন জনপদের লোকদের দৈন্য ও অনাহারক্লিষ্টতা ও নিজের শহর অপেক্ষা বেশি প্রয়োজনীয়তার কথা জানা যায়, তাহলে সেখানেও পাঠানো যেতে পারে। কারণ, যাকাত দানের আসল উদ্দেশ্য হল ফকীর-মিসকীনদের অভাব দূর করা। এজন্যই হযরত মুআয (রা) ইয়ামেনের সদ্‌কার মধ্যে বেশির ভাগ কাপড় নিতেন, যাতে গরীব মুহাজিরদের জন্য তা মদীনায় পাঠাতে পারেন। (দারে কুতনীর উদ্ধৃতিতে কুরতুবী)

যদি কোন একটি লোক এক শহরে থাকে, কিন্তু তার মালামাল থাকে অন্য শহরে তবে যে শহরে সে নিজে থাকে তারই হিসাব করতে হবে। কারণ, যাকাত দেয়ার জন্য এ লোকটিকেই সম্বোধন করা হয়েছে।—(কুরতুবী)

মাস'আলা ঃ যে মালের যাকাত ওয়াজিব তা আদায় করার জন্য এমন করাও জায়েয যে, সে মালের চল্লিশ ভাগের একভাগ তা থেকে পৃথক করে যাকাতের হকদারকে দিয়ে দেবে। যেমন ব্যবসায়ের কাপড়, বাসন-কোসন, আসবাবপত্র প্রভৃতি। আবার এও হতে পারে যে, যাকাতের পরিমাণ মালের মূল্য বের করে নিয়ে তা হকদারদের মাঝে বন্টন করে দেবে। সহীহ্‌ হাদীসসমূহের দ্বারা এমন করার প্রমাণ পাওয়া যায়।—(কুরতুবী)। আর কোন কোন ফিকাহ্‌বিদ বলেছেন যে, বর্তমান যুগে নগদ মূল্য দান করাই উত্তম। তার কারণ, ফকীর-মিসকীনদের বিভিন্ন রকমের প্রচুর প্রয়োজনয়ীতা রয়েছে, নগদ পয়সা পেলে সে যে কোন প্রয়োজনে ব্যবহার করতে পারে।

মাস'আলা ঃ যদি যাকাতের হকদার আপনজন হয়, তবে তাদেরকে যাকাত সদ্‌কা দান করা অধিকতর উত্তম এবং তাতে দ্বিগুণ সওয়াব হয়। একটি সওয়াব সদ্‌কার এবং অপরটি আত্মীয় বৎসলতার। এতে এমন কোন আবশ্যকতাও নেই যে, তাদেরকে একথা জানিয়ে দেবে যে, এদেরকে যাকাত সদ্‌কা দেয়া হচ্ছে। কোন উপহার-উপঢৌকন হিসেবেও দেওয়া যেতে পারে, যাতে গ্রহীতা ভদ্রলোক নিজের হীনতা অনুভব করতে না পারে।

মাস'আলা ঃ যে লোক নিজেকে নিজের কথা ও কার্যকলাপের মাধ্যমে যাকাত পাবার যোগ্য অভাবী বলে প্রকাশ করে এবং সদ্‌কা প্রভৃতি চায়, তবে দাতার জন্য কি

তার প্রকৃত অবস্থা যাচাই করা প্রয়োজন? আর যাচাই না করে কি সদ্‌কা দেবে না? এ প্রশ্নে হাদীসের রেওয়ায়েত ও ফিকাহ্‌বিদগণের বক্তব্য এই যে, এর কোন প্রয়োজন নেই। বরং বাহ্যিক অবস্থার দ্বারা যদি এ ধারণা প্রবল হয় যে, এ লোকটি প্রকৃতই ফকীর ও অভাবগ্রস্ত, তবে তাকে যাকাত দেয়া যেতে পারে। যেমন, হাদীসে রয়েছে যে, রসূলে করীম (সা)-এর খিদমতে অত্যন্ত দুরবস্থায় কিছু লোক এসে উপস্থিত হল। তিনি তাদের জন্য লোকদের কাছ থেকে সদ্‌কা সংগ্রহ করতে বললেন এবং যথেষ্ট পরিমাণ সংগৃহীত হওয়ার পর সেগুলো তাদের দিয়ে দেয়া হয়। মহানবী (সা) সেসব লোকের অভ্যন্তরীণ অবস্থা যাচাই করার কোন প্রয়োজনয়ীতা অনুভব করেননি।—(কুরতুবী)

অবশ্য কুরতুবী আহ্‌কামুল কোরআন গ্রন্থে বলেছেন, সদ্‌কা-যাকাতের ব্যয়খাত-গুলোর মধ্যে একটি রয়েছে ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি। সুতরাং যদি কেউ বলে যে, আমার উপর এত বিপুল ঋণ, যাকাতের অর্থ দিন তবে এই ঋণের প্রমাণ তার কাছে দাবি করা উচিত। (কুরতুবী)। আর একথা বলাই বাহুল্য যে, ঋণগ্রস্ত, বিদেশী মুসাফির, ফী-সাবীলিল্লাহ্‌, প্রভৃতির ক্ষেত্রেও এ ধরনের যাচাই করে নেয়া কোন কঠিন ব্যাপার নয়। বরং এসব ব্যয়ক্ষেত্র সম্পর্কে সুযোগমত যাচাই অনুসন্ধান করে নেয়া বান্ছনীয়।

মাস'আলা ঃ যাকাতের মাল নিজের আত্মীয়-আপনজনদের দেয়া সবচেয়ে উত্তম। কিন্তু স্বামী-স্ত্রী এবং পিতামাতা ও সন্তান-সন্ততির মধ্যে পারস্পরিকভাবে একে অপরকে দিতে পারে না। কারণ, এদেরকে দেয়া একদিক দিয়ে নিজের কাছেই রেখে দেয়ার শামিল। কারণ, এসব লোকের খাত সাধারণত যৌথই থাকে। স্বামী যদি স্ত্রীকে কিংবা স্ত্রী যদি স্বামীকে নিজের যাকাত দান করে, তবে প্রকৃতপক্ষে তা নিজেরই ব্যবহারে রয়ে গেল। তেমনিভাবে পিতামাতা ও সন্তান-সন্ততির ব্যাপার। সন্তানের সন্তান এবং দাদা-পরদাদারও একই হুকুম; তাদেরকে যাকাত দেয়া জায়েয নয়।

মাস'আলা ঃ যদি কোন লোক কাউকে নিজের ধারণা অনুযায়ী হকদার ও যাকাতের ব্যয়খাত মনে করে যাকাত দিয়ে দেয় এবং পরে জানা যায় যে, লোকটি তারই ক্রীত-দাস ছিল কিংবা কাফির ছিল, তবে এ যাকাত আদায় হবে না। পুনরায় দিতে হবে। কারণ, ক্রীতদাসের মালিকানা মূলত তার মনিবেরই মালিকানায়। কাজেই তা তার নিজের মালিকানা থেকেই পৃথক হয়নি। তাই এ যাকাতও আদায় হলো না। আর কাফিরকে সদ্‌কা-যাকাত দেয়া পুণ্যের বিষয় নয়।

এছাড়া পরে যদি জানা যায় যে, যাকে যাকাত দেয়া হয়েছে সে সম্পদশালী, সৈয়দ বা হাশেমী বংশোদ্ভূত ছিল কিংবা নিজেরই পিতা, পুত্র, স্বামী অথবা স্ত্রী ছিল, তবে সে ক্ষেত্রে পুনরায় যাকাত দানের প্রয়োজন নেই। কারণ, যাকাতের অর্থ তার মালিকানা থেকে বেরিয়ে গিয়ে সওয়াবের স্থানে পেঁৗছেছে। তবে খাত নির্ধারণে সন্দেহের কারণে যে ভুল সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে, তা মাফ।—(দুররে মুখতার)। সদ্‌কার আয়াতের তফসীর এবং তার প্রাসঙ্গিক মাস'আলা-মাসায়েলের প্রয়োজনীয় বিবরণ সমাপ্ত হল।

وَمِنْهُمُ الَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ النَّبِيَّ وَيَقُوْلُوْنَ هُوَ اُذُنٌ ؕ قُلْ اُذُنُ
خَيْرٍ لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِيْنَ
اٰمَنُوْا مِنْكُمْ ؕ وَالَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ رَسُوْلَ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ
اَلِيْمٌ ﴿٦١﴾ يَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ لَكُمْ لِيُرْضُوْكُمْ ۚ وَاللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗۤ اَحَقُّ
اَنْ يُّرْضُوْهُ اِنْ كَانُوْا مُؤْمِنِيْنَ ﴿٦٢﴾ اَلَمْ يَعْلَمُوْۤا اَنَّهٗ مَنْ يُّحَادِدِ اللّٰهَ
وَرَسُوْلَهٗ فَاَنَّ لَهٗ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيْهَا ؕ ذٰلِكَ الْخِزْيُ
الْعَظِيْمُ ﴿٦٣﴾ يَحْذَرُ الْمُنٰفِقُوْنَ اَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُوْرَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا
فِيْ قُلُوْبِهِمْ ؕ قُلِ اسْتَهْزِءُوْا ۚ اِنَّ اللّٰهَ مُخْرِجٌ مَّا تَحْذَرُوْنَ ﴿٦٤﴾
وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ لَيَقُوْلُنَّ اِنَّمَا كُنَّا نَخُوْضُ وَنَلْعَبُ ؕ قُلْ اَبِاللّٰهِ
وَاٰيٰتِهٖ وَرَسُوْلِهٖ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِءُوْنَ ﴿٦٥﴾ لَا تَعْتَذِرُوْا قَدْ كَفَرْتُمْ
بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ ؕ اِنْ نَّعْفُ عَنْ طَآئِفَةٍ مِّنْكُمْ نُعَذِّبْ طَآئِفَةًۢ
بِاَنَّهُمْ كَانُوْا مُجْرِمِيْنَ ﴿٦٦﴾ ع

(৬১) আর তাদের মধ্যে কেউ কেউ নবীকে ক্লেশ দেয়, এবং বলে, এলোকটি তো কানসর্বস্ব। আপনি বলে দিন, কান হলেও তোমাদেরই মঙ্গলের জন্য, আল্লাহর উপর বিশ্বাস রাখে এবং বিশ্বাস রাখে মুসলমানদের কথার উপর। বস্তুত তোমাদের মধ্যে যারা ঈমানদার তাদের জন্য তিনি রহমতবিশেষ। আর যারা আল্লাহ্র রসূলের প্রতি কুৎসা রটনা করে তাদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক আযাব। (৬২) তোমাদের সামনে আল্লাহ্র কসম খায় যাতে তোমাদের রাযী করতে পারে। অবশ্য তারা যদি ঈমানদার হয়ে থাকে, তবে আল্লাহ্কে এবং তার রসূলকে রাযী করা অত্যন্ত জরুরী। (৬৩) তারা কি একথা জেনে নেয়নি যে, আল্লাহ্র সাথে এবং তার রসূলের সাথে যে মুকাবিলা করে তার জন্য নির্ধারিত রয়েছে দোযখ; তাতে সবসময় থাকবে। এটিই হল মহা-অপমান। (৬৪) মুনাফিকরা এ ব্যাপারে ভয় করে যে, মুসলমানদের উপর না এমন কোন সূরা নাযিল হয়, যাতে তাদের অন্তরের গোপন বিষয় অবহিত করা হবে।